শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা
ইসকন শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয় মন্দিরে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ
অদ্বৈত আচার্য
নিত্যানন্দ প্রভু
চৈতন্য মহাপ্রভু
গদাধর পণ্ডিত
শ্রীবাস ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের

অনুকম্পিত

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের

শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীসনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কর্তৃক সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Sri Sri Panchatatva Mahima (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীরাধাষ্টমী ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

সূচীপত্র

ভূমিকা

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

আমরা বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ধন্য কলিযুগের মানুষ। এই যুগের যুগধর্ম হল হরিনাম সংকীর্তন করা। পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরিনাম প্রচার করেছেন এই কলিতে আবির্ভূত হয়ে। যে কোনও ব্যক্তিই সেই হরিনাম করতে পারে। কলির লোকেরা সাধারণতই পাপপ্রবণ। মানুষ পাপপ্রবণ মানসিকতারও পরিবর্তন করতে পারে যদি সে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে আগ্রহী হয়।

সেই পঞ্চতত্ত্ব-আত্মক শ্রীকৃষ্ণকে জানার দরকার আছে। তাঁর শরণাগত হওয়ার দরকার আছে। কেননা আমাদের মতো বদ্ধজীবকে অহৈতুকী অশেষ কৃপা দানের জন্য শ্রীভগবান পঞ্চতত্ত্ব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। যে কৃপা অন্য যুগে কিংবা অন্য কলিযুগেও লোকে পায় না। সেই জন্য এই কলিযুগকে বলা হয় ধন্য কলিযুগ। শাস্ত্রে নির্ধারিত হয় যে, এই যুগের মানুষ পঞ্চতত্ত্ব-আত্মক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা পূর্বক বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চলোকে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। সেই পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভের জন্য প্রকাশিত হল ভক্তিপ্লুত নিবেদন স্বরূপ "শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা" গ্রন্থখানি।

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত এবং ভক্তশক্তি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে প্রণতি নিবেদন করি।

নমামি শ্রীগৌরচন্দ্রং নিত্যানন্দমদ্বৈতকং ।
গদাধর-শ্রীবাসাদি-ভক্তেভ্যশ্চ নমো নমঃ ॥

মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকে প্রণতি নিবেদন করি। শ্রীগদাধর প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ সমস্ত গৌরভক্তকে বারংবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গৌরকান্তি ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ধারণ করেছেন, তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি সর্বাপেক্ষা করুণাময়, তিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রণাম

নিত্যানন্দমহং নৌমি সর্বানন্দকরং পরম্ ।
হরিনামপ্রদং দেবম্ অবধূতশিরোমণিম্ ॥

সকলকে পরম আনন্দ প্রদানকারী, হরিনাম প্রদানকারী, সকল অবধূতের শিরোমণি পরম প্রভু শ্রীমন্ নিত্যানন্দকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীঅদ্বৈত প্রণাম

শ্রীঅদ্বৈত! নমস্তুভ্যং কলিজনকৃপানিধে ।
গৌরপ্রেমপ্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ ॥

হে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, আপনি কলিযুগের জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি গৌরপ্রেম প্রদাতা। হে শ্রী-সীতাপতি, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীগদাধর প্রণাম

শ্রীহ্লাদিনীস্বরূপায় গৌরাঙ্গসুহৃদায় চ।
ভক্তশক্তিপ্রদানায় গদাধর! নমোঽস্তু তে ॥

হে শ্রীগদাধর প্রভু, আপনি ভক্তদের ভক্তিশক্তি দান করেন, আপনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শক্তি, আপনি ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীশ্রীবাস প্রণাম

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গপ্রিয় পার্ষদং।
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর কৃপাকণা মাত্র লাভ হলে হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি প্রেম জাগরিত হয়।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক।

মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ভক্তিজীবনের পরম আশ্রয় পঞ্চতত্ত্ব

এই জগতে থাকতে হলে প্রত্যেক জীবের যেমন একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, তেমনই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন ও পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রত্যেক ভক্তের একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন আশ্রয়তত্ত্ব। গুরুদেবের কৃপা ও আশ্রয় বিনা ভক্তি অনুশীলনের সূচনাও সম্ভবপর নয়।

গৌরপার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু বলেছেন, পঞ্চতত্ত্বের এক-একজন এক-এক রকমের আশ্রয় তত্ত্বের প্রতিভূ বা প্রতিমূর্ত বিগ্রহ। নিষ্ঠাবান ভক্তের উচিত পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকের কাছে তাঁদের আশ্রয় ও কৃপা প্রার্থনা করা, যাতে সে ভক্তিপথে প্রগতি সাধন করতে ও রসরাজ-মহাভাব (রাধা-কৃষ্ণ) মিলিত তনু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম আশ্রয় লাভ করতে পারে। পঞ্চতত্ত্বের শ্রীবাস ঠাকুর হচ্ছেন শুদ্ধনাম আশ্রয়ের প্রতিভূ-বিগ্রহ। তিনি অভিন্ন নারদমুনি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন পাঞ্চরাত্রিক বিধি আশ্রয়ের প্রতিভূ। শ্রীগদাধর পণ্ডিত হচ্ছেন ভাবাশ্রয় তত্ত্ব। পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেম লাভের প্রারম্ভিক স্তর যে ভাব, সে ভাবের আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন প্রেম-আশ্রয়। কৃষ্ণপ্রেমের আশ্রয় বিগ্রহ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন রস-আশ্রয়। রস-আশ্রয় তত্ত্ব বিগ্রহ।

১। ভগবান সর্ব নিয়ন্তা। তাঁর কৃপাকটাক্ষ বিনা আমরা কেউই ভালোমতো বাঁচতে পারি না। আমাদের সুস্থ সুন্দর কল্যাণময় জীবন গঠনের জন্য ভগবানের কৃপা অবশ্যই প্রয়োজন, সেজন্য আমাদের যত্ন নিতে হবে। বিধি নিয়ম পালন করা, বিগ্রহ পূজা অর্চনা করা, ভোগ নিবেদন করা, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা, ভগবানের বন্দনা করা ইত্যাদি। কোনও বিধি পালন করব না, ভগবান কেবল করুণা করতে থাকবে—এরকম মনোভাব কল্যাণকামী মানুষের হৃদয়ে থাকে না। বিধিনিষেধ পালন পূর্বক ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন পদ্ধতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন নিষ্ঠাবিধির প্রতিভূ বিগ্রহ বা পাঞ্চরাত্রিক-আশ্রয়-তত্ত্ব।

২। আমরা কষ্ট পাই বিভিন্ন কালের পাপকর্মের ফলে। সমস্ত পাপের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করা, জপ করা, কীর্তন করা। নামবলে অনন্তকোটি লোক অবশ্যম্ভাবী বহুবিধ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছে। সমস্ত ভয় দূর হয়, সমস্ত বিঘ্ন নাশ হয়, সমস্ত অমঙ্গল লুপ্ত হয় ভগবানের দিব্য নামের গুণে। যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই মর্ম বিশেষভাবে উপলব্ধি করে কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা রাখবেন। শ্রীবাস ঠাকুর হচ্ছেন ভগবানের নামের প্রতিভূ বিগ্রহ বা নাম-আশ্রয়-তত্ত্ব।

৩। বদ্ধজীব বিভিন্ন জনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে চায়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তার নিত্যসম্বন্ধ বিষয়ে কোনও খেয়ালই রাখে না বা চিন্তাই করে না। যার ফলে তার মধ্যে অশান্তি ও অভাব অনুভূত হয়। অশান্তি ও অভাবের সমাধান হয় যদি সে ভগবানের সঙ্গে তার ভাবের সম্বন্ধ রক্ষা করে। তাতে তার সমস্ত প্রাদুর্ভাব ও অভাব দূরীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্তরঙ্গ ভক্তিভাবের প্রয়োজন রয়েছে। ভাবের ঘরে চুরি করলে, প্রতারণা বা ফাঁকি জুকি দিলে বিপদ আছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবিরত ভাব রেখে চলাটাই জীবের স্বরূপ স্বভাব। সেই ভাবের প্রতিভূ বিগ্রহ বা ভাব-আশ্রয়-তত্ত্ব হচ্ছেন শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

৪। নিজের সুখ কি করে হবে, সেই উদ্দেশ্যে দিন দিন যোষিৎ, জমি ও টাকার চিন্তায় যদি অতিবাহিত হয়, তা হলে তা পরিণামে দুঃখ ও হতাশা আনে। সমস্ত কিছুই যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানার্থে নিযুক্ত হয় এবং আমাদের নিজেদের জীবন যাপন পদ্ধতি যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তবে তা আমাদের হৃদয়ে নিত্য দিব্য আনন্দ সঞ্চার করে। নিজের সুখভোগ চিন্তাটি হল কাম এবং কৃষ্ণের সুখচিন্তাটি হল প্রেম। অন্ধকারের সঙ্গে কামের তুলনা, আলো বা সূর্যের সঙ্গে প্রেমের তুলনা করা হয়ে থাকে। আমরা যদি নিত্য

আনন্দ লাভের আশা করে থাকি তবে প্রেম নিয়ে থাকতে হবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন প্রেমের প্রতিভূ বিগ্রহ বা প্রেম-আশ্রয়-তত্ত্ব।

৫। প্রতিটি জীব কোন না কোন রসে নিমজ্জিত আছে। রস বিনা জীবন নীরস বা বৃথা। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মাধুর্য ইত্যাদির মধ্যে যে-কোনও রসের সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হয়ে জীব রয়েছে। সমস্ত জড় রস চিন্ময় রসের প্রতিফলন বলা চলে। পরিণামে তা বিরস হয়ে যায়। জড় রসের ঊর্ধ্বে চিন্ময় রস। চিন্ময় আনন্দরসের সর্বোচ্চ উজ্জ্বল উন্নত রস হচ্ছে জীবের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমরস। সর্ব ভাবের, সর্ব প্রেমের, সর্ব রসের সীমা সেই রস। সেই সর্ব-উজ্জ্বল রসের প্রতিভূ বিগ্রহ বা রস-আশ্রয়-তত্ত্ব হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রপঞ্চকে জয় এবং পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভের উদ্দেশ্যে অবশ্যই শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশ

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

ভক্তরূপ

কঠ উপনিষদে শ্রীভগবানকে বলা হয়েছে, নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্—"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে পরম নিত্য এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন।" জীবও নিত্য ও চেতন শক্তি, কিন্তু আয়তনগতভাবে জীবেরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আর, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম চেতন ও পরম নিত্য। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্যের নিত্য দাস মাত্র। সেই বিভুচৈতন্য পরমচৈতন্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়েও যখন বিশেষ কালে ভক্তরূপে লীলাবিলাস করেন, কৃষ্ণভক্তি চেতনায় কলিবদ্ধ জীবকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ভক্তি আচার ও প্রচার করেন, সেই ভগবানকে তখন বলা হয় ভক্তরূপ। সেই ভক্তরূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। জীব যদি কৃষ্ণসেবা না করে, তা হলে সেটি জীবের স্বরূপের বিকৃত রূপ। পরম চেতনের সঙ্গে যার সম্বন্ধ-জ্ঞান নেই, তাকেই অজ্ঞান বা অচৈতন্য বলা যায়। অচৈতন্য জীবকে কৃষ্ণভাবনামৃত দিয়ে সচেতন করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপ ধারণ করে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হলেন এই ধরাধামে।

প্রভু রূপে ভক্তের সেবা গ্রহণ করে ভগবান আনন্দিত হন, কিন্তু ভগবানের সেবা করে ভক্তের যে আনন্দ, তা আস্বাদন করবার উদ্দেশ্যে ভগবান ভক্তরূপ বা ভক্তভাব অবলম্বন করেন।

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরসের এমনই এক স্বভাব রয়েছে যে, সেই রস পূর্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তভাব অবলম্বন করেন। (চৈঃ চঃ আদি ৭/১১)

ভক্তস্বরূপ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ শ্রীবলরাম এ জগতে শ্রীনিত্যানন্দ রূপে প্রকাশিত। ভগবানের অভিভাবক, ভগবানের সখা, ভগবানের সেবক বা দাস রূপে ভগবানের ধারক ও বাহক রূপে তিনি প্রকাশিত।

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি ।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই ॥

লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অবলম্বন করলেন এবং তাঁর বড় ভাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন ভক্তস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় জগতের জীবের মন সর্বপ্রকার জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, বিষয় আসক্তি দূর হয়, আনন্দময় ভগবদ্ধাম দর্শন হয়।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর গেয়েছেন—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে ।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

নিত্য ভক্তিময় আনন্দে নিমগ্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জড়বদ্ধ জীবকে নিত্য ভগবৎ সেবানন্দ প্রদান করতে আবির্ভূত হলেন।

ভক্ত-অবতার

সদাশিব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের মহান ভক্ত। তিনি ভগবানের অংশপ্রকাশ মহাবিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য-গোসাঞি ॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য-প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত-অবতার। সমস্ত গুণের আধার অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর প্রধান অঙ্গ, তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন। তাই তিনি অদ্বৈত। তিনি বিশ্বে অবতরণ করে ভগবদ্‌ভক্তি প্রবর্তন করেন, কৃষ্ণভক্তি দিয়ে সর্বজীবকে

উদ্ধার করেন, ভক্তির আলোকে ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। বদ্ধজীবকে ভক্তি শিক্ষা দিয়ে উদ্ধার করেন, তাই তিনি আচার্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত আচার্য প্রভু—তিনজনেই বিষ্ণুতত্ত্ব।

এই তিন তত্ত্ব—'সর্ব আরাধ্য' করি মানি ।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—'আরাধক' জানি ॥

সমস্ত জীবের উপাস্য হচ্ছেন মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু। আর ভক্ততত্ত্ব হচ্ছেন তাঁদের উপাসক।

শুদ্ধভক্ত

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁর-সবার গণন ॥

শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভগবানের যত কোটি কোটি ভক্ত আছেন, তাঁরা সবাই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের মাধ্যমেই ভগবান সংসারবদ্ধ জীবকে ভগবদ্‌ভক্তি অনুশীলনের অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ আচরণে আদৌ আকৃষ্ট নন। সেই শুদ্ধভক্তদের কৃপা-কণায় আমরা বদ্ধজীব ভক্তি অনুশীলন করার যোগ্যতা লাভ করতে পারি এবং আমাদের পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভের অধিকারী হতে পারি।

ভক্তশক্তি বা অন্তরঙ্গ ভক্ত

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি' অবতার ।
'অন্তরঙ্গভক্ত' করি গণন যাঁহার ॥

ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন শক্তিতত্ত্ব। তাঁদের মধ্যে কেউ মধুর-রসে, কেউ বাৎসল্য রসে, কেউ সখ্য রসে এবং কেউ দাস্য রসে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা সকলেই শুদ্ধ ভক্ত। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, মাধুর্যরসে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্ত অন্য সকলের থেকে শ্রেয়।

মধুর রসে নিত্য আশ্রিত ভক্তরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'অন্তরঙ্গ' সেবক।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব

প্রমাণখণ্ডে শ্রীশিব ঠাকুর পার্বতীদেবীকে বলছেন—

নাহং বসামি কৈলাসে ন ত্বং বসসি মদ্‌গৃহে ।
ন দেবা দিবি তিষ্ঠন্তি ঋষয়ো ন বনে বনে ॥
সর্বে বয়ং নবদ্বীপে তিষ্ঠামঃ প্রেমলালসাঃ ।
গৌর-গৌরেতি গায়ন্তঃ সংকীর্তনপরা ভুবি ॥

প্রকৃতপক্ষে আমি কৈলাসে বর্তমান নই, তুমি কৈলাসে আমার ঘরে বর্তমান নও। দেবতারাও স্বর্গে অবস্থান করেন না, ঋষিরাও বনে বনে অবস্থান করেন না। আমরা সবাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমলাভের আশা নিয়ে গৌরনাম সংকীর্তন করতে করতে পৃথিবীতে নবদ্বীপ ধামে বাস করছি ॥

যে নরাঃ কৃতিনো দেবি নবদ্বীপে বসন্তি তে ।
জীবনে মরণে তেষাং পতিরেকো মহাপ্রভুঃ ॥

যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ নবদ্বীপ ধামে বাস করেন, একমাত্র মহাপ্রভুই জীবনে মরণে সর্বক্ষণ তাঁদের প্রতিপালক রয়েছেন ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং গৌরং কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্ ।
যে ভজন্তি নবদ্বীপে তে মে প্রিয়তমাঃ কিল ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞক পঞ্চতত্ত্ব-আত্মক শ্রীগৌরসুন্দরকে নবদ্বীপে যাঁরা ভজনা করেন, তাঁরা আমার প্রিয়তম বলে জানবে ॥

পদ্মাকারং নবদ্বীপং অন্তর্দ্বীপঞ্চ কর্ণিকাম্ ।
সীমন্তাদিস্থলাংস্তত্র দলানষ্ট-স্বরূপকান্ ॥

এই নবদ্বীপক্ষেত্র পদ্ম আকারে অবস্থিত। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর ক্ষেত্রটি এই পদ্মের কর্ণিকা স্বরূপ এবং সীমন্ত ইত্যাদি অষ্ট দ্বীপ অষ্ট পাপড়ির মতো।

যত্র তত্র নবদ্বীপে স সন্ন্যাস্যথবা গৃহী ।
হা গৌরেতি বদন্নিত্যং সর্বানন্দান্ সমশ্নুতে ॥

এই নবদ্বীপের যে কোনও স্থানে কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, যে কোনও ব্যক্তি নিরন্তর "হা গৌর" "হা গৌর" বলে কীর্তন করলে নিখিল আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ।

এতদ্ হি জন্ম সাফল্যং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ ।
ভজনং শ্রীনবদ্বীপে ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

বিশেষতঃ বৈষ্ণবজনদের জন্ম সার্থক যে তারা নবদ্বীপধামে ব্রজবাসীদের অনুরূপ ভজন করতে সমর্থ হয় ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে জড়কর্মানি গৌরে দৃষ্টে পরাৎপরে ॥

পরাৎপর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দর্শন করলে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় ছেদন হয় এবং সমস্ত জড়কর্ম ক্ষয় হয় ॥

প্রসাদং পরমেশানি গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ ।
পাবনং সর্বজীবানাং দুর্লভং দুস্কৃতাং কিল ॥

হে মহেশ্বরি! মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রসাদ সমস্ত জীবকে পবিত্র করে। কিন্তু দুষ্কৃতী ব্যক্তিদের পক্ষে তা দুর্লভ ॥

অহং ব্রহ্মা ত্বমীশানি দেবাশ্চ পিতরস্তথা ।
মুনয়ো ঋষয়ঃ সর্বে প্রসাদযাচকাঃ ধ্রুবম্ ॥

আমি, তুমি, ব্রহ্মা, দেবতারা, পিতৃপুরুষেরা, মুনিঋষিরা সবাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ পেতে চাই ॥

ভোজনে পরমেশস্য প্রসাদসেবনং ভবেৎ
কিং পুনঃ শ্রদ্দধানস্য হরিনামপরস্য চ ।
গৌর প্রসাদভক্তস্য ভাগ্যং তত্র বদাম্যহম্ ॥

এখানে সাধারণ সাত্ত্বিক ভোজনমাত্রেই ভগবানের প্রসাদ সেবনের ফল হয়, আর যারা শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত ও হরিনামপরায়ণ হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবন করেন, তাদের ভাগ্যের কথা আমি আর কি বলব!

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব

জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম প্রদান করলেন

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান পঞ্চতত্ত্বরূপে পৃথিবীতে লীলাবিলাস করলেন। তাঁরা পৃথিবীতে মহানন্দে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করলেন। জগৎ-সংসারকে কৃষ্ণপ্রেম দান করলেন।

পঞ্চতত্ত্ব হল—

১। ঈশতত্ত্ব—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

২। প্রকাশতত্ত্ব—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

৩। অবতার তত্ত্ব—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য

৪। শক্তিতত্ত্ব—শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি—ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি তত্ত্ব

৫। ভক্ততত্ত্ব—শ্রীবাস আদি জীবতত্ত্ব।

কলিযুগে পৃথিবীতে যাঁরা সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁরাই পঞ্চতত্ত্ব আরাধনা করবেন। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে বর্ণিত হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যাঁর মুখে সর্বদা কৃষ্ণ নাম, যাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, যিনি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত, সেই মহাপুরুষকে কলিযুগের সুবুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করবেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩২)

এখানে আরাধ্য হচ্ছেন ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাঁর 'অঙ্গ' হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু, 'উপাঙ্গ' শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ, 'পার্ষদ' হচ্ছেন গদাধর পণ্ডিত, 'অস্ত্র' হচ্ছে দুঃখময় জন্মমৃত্যুর চক্রচ্ছেদনকারী কৃষ্ণনাম।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, কেননা চিন্ময় স্তরে সবকিছুই পরম। কিন্তু তবুও চিন্ময় স্তরে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং সেই বৈচিত্র্য আস্বাদন করবার জন্য প্রতি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নিরূপণ করতে হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পঞ্চতত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন—পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঁচটি বিভিন্ন প্রকার লীলা প্রকাশ করবার জন্য পঞ্চতত্ত্ব রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাঁরা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের জন্য তাঁরা বিবিধ চিৎ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত কোন ভেদ নেই। কিন্তু রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তস্বরূপে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্ত অবতার রূপে, গদাধর প্রভু ভক্তশক্তি রূপে এবং শ্রীবাস প্রভু শুদ্ধভক্ত রূপে—এই পাঁচ প্রকারে বিবিধ বৈশিষ্ট্য যুক্ত। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ এবং ভক্ত অবতারই যথাক্রমে স্বয়ং, প্রকাশ ও অংশ রূপে বিষ্ণুতত্ত্ব। ভক্তশক্তি ও শুদ্ধভক্ত—বিষ্ণুতত্ত্বের অন্তর্গত আশ্রিত শক্তিতত্ত্ব।

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে এসেছিলেন, তখন তিনি কেবল শরণাগত ভক্তদেরই রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সপার্ষদ মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে কোন যোগ্যতার অপেক্ষা না করে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য কেউ অতি দুর্লভ প্রেম দান করতে পারেন না। মহাপ্রভুর প্রিয় জনেরা স্থান-অস্থানের কথা বিচার না করে যাকেই পেরেছেন তাকেই কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন। কৃষ্ণপ্রেম দান করলে তা ফুরিয়ে যায় না বরং বৃদ্ধি পায়। অনন্ত কোটি জীব যদি কৃষ্ণভাবনাময় হতে চায়, তা হলে ভগবৎ প্রেমের কোনও অভাব হবে না এবং তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিরও অভাব হবে না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত এবং প্রত্যেক জীবেরই কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু তবুও সেই সঙ্গে সঙ্গে এই জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনাও রয়েছে। ভোগবাসনার বীজই অংকুরিত হতে হতে বিশাল ভোগের বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বীজগুলি কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় ডুবে থাকলে আর অংকুরিত হয় না। তখন জড় ভোগাসক্তি অন্তর্হিত হয়।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী উল্লেখ করেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে বিষয়ী মানুষেরা স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধীয় কথা বলতে বিরক্তি অনুভব করেন, বেদ পাঠ বর্জন করেন, অষ্টাঙ্গিক যোগীরা ক্লেশকর যোগসাধনা ত্যাগ করেন, তপস্বীরা কঠোর তপোশ্চর্যা পরিত্যাগ করেন, সন্ন্যাসীরা সাংখ্য দর্শন অধ্যয়ন বর্জন করেন। এভাবে মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত রসমাধুর্য আস্বাদন করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, পঞ্চতত্ত্বের পাঁচজন যতই জগতে প্রেমবৃষ্টি দান করেন, ততই মহানন্দ প্রেমবন্যায় জল বাড়তে থাকে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু প্রেমের স্পর্শ তারাই পেল না, যারা বড় বড় মহা দক্ষ মূর্খ—মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ডী এবং অধম পড়ুয়া। এরা সবাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মহাদক্ষ। এবং সেই জন্য মহাদক্ষদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃত বন্যা স্পর্শই করতে পারে না। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত জগৎকে প্রেমের বন্যায় নিমজ্জিত করতে মনস্থ করলেও অনেকে এড়িয়ে গেল, তাই তাদের সকলকে পুনরায় ডুবানোর জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করলেন। লোকে যুগে যুগে সন্ন্যাসীকেই সম্মান দিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত তৎকালীন লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসীকেও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন কেননা মায়াবাদীরা জগৎ মিথ্যা করে

করেই সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছে, তাদেরকেই ভক্তিযোগ শেখাতে হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হলেন। সন্ন্যাসী বিনা অন্য কেউ সন্ন্যাসীকে শেখাতে পারে না।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সেই ব্যক্তিদেরই বর্ণনা দিয়েছেন যারা কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে উদাসীন। কৃষ্ণভাবনামৃত এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মহাদক্ষ।

১। মায়াবাদী ঃ যে মনে করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শরীরটাও মায়া দ্বারা রচিত জড় বস্তু। এই শ্রেণীর লোক মনে করে, ভগবানের ধামও, ভগবদ্ ভক্তি এটাও একরকমের মায়া, ভক্তির উপকরণ সবই মায়া অর্থাৎ সব জড় অস্তিত্ব যুক্ত এবং ভগবদ্ ভক্তি হচ্ছে একটা সকাম কর্ম মাত্র। একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন হওয়াটাই মুক্তি।

২। কর্মনিষ্ঠ ঃ এই শ্রেণীর লোক কৃষ্ণভক্তিকেও সকাম কর্ম বলে মনে করে। এরা মনে করে, যা হোক কিছু করে পেট চালাতে হয়, কৃষ্ণভক্তিটাও সেরকম একটা কিছু।

৩। কুতার্কিক ঃ এই শ্রেণীর লোক মনে করে, ভক্তরা যখন জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র হবে তখন মুক্তির স্তরে আসবে। সে নিজেকে যথার্থ জ্ঞানী মনে করেই কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে তর্ক শুরু করে।

৪। নিন্দুক ঃ ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তনে এই শ্রেণীর লোকদের মন নেই, হরিনাম জপে নিষ্ঠা নেই। ভক্তের ভক্তির সমালোচনা করতে এরা পঞ্চমুখ।

৫। পাষণ্ডী ঃ পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যান্য দেবদেবীকে এরা সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে।

৬। অধম পড়ুয়া ঃ ভগবানের চরণে শরণাগত হয়ে থাকাই বিদ্যার লক্ষ্য, সে কথা না জেনে এরা বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলে নির্ণয় করে।

এরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত স্পর্শ করতে পারল না। কিন্তু যখনই মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হয়ে তাদেরকে আকর্ষণ করলেন, তখন মায়াবাদী

সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে যত পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্মী, নিন্দুক সবাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হল। মহাপ্রভু তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং সবাইকে কৃষ্ণভাবনামৃতের সাগরে নিমজ্জিত করলেন। সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করবার জন্য মহাপ্রভু নানারকমের লীলা অবলম্বন করলেন।

শঙ্করাচার্যের অনুগামী কাশীর মায়াবাদীরা হরিনাম কীর্তন নৃত্য আদৌ পছন্দ করেন না। তারা মনে করেছিল যে এসব ভাবালুতা মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীতে গিয়ে পৌঁছালে মহাপ্রভুকে সেই সন্ন্যাসীদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলেন, তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তুমি কেশবভারতীর শিষ্য। খুব ভাল। কিন্তু তুমি সন্ন্যাসী হয়ে ভাবুকের মতো নাচো গাও কেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম হল বেদান্ত পাঠ করা, চোখ বুজে ধ্যান করা। কিন্তু তুমি সেসব না করে ভাবুকের মতো নাচছ গাইছ। কি ব্যাপার? তোমাকে দেখতে কতো সুন্দর, মনে হচ্ছে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। কিন্তু তুমি নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মতো আচরণ করছ কেন?

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, হে শ্রীপাদ, দয়া করে শুনুন, আমি মূর্খ দেখে আমার গুরুদেব শ্রীমৎ কেশবভারতী মহারাজ আমাকে শাসন করে বলেন, তুমি মূর্খ, তোমার কোন বেদ-বেদান্তে অধিকার নেই। তুমি কেবল সবসময় কৃষ্ণমন্ত্র জপ করতে থাকো। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ-কীর্তন করতে থাকলে তুমি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে, কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন করতে পারবে। এখন কলিকাল। এই কলিকালে সমস্ত মন্ত্রের সার হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র। এই নামকীর্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম। এটি সর্বশাস্ত্রের মর্ম। আমার গুরুদেব তখন একটি শাস্ত্র উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই। গুরুদেবের কাছে সেই আদেশ পেয়ে, আমি নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে লাগলাম, এভাবে নাম করতে করতে আমার মন বিভ্রান্ত হল। আমার ধৈর্য থাকল না। আমি স্থির থাকতে পারলাম না। পাগলের মতো হাসতে লাগলাম, কাঁদতে লাগলাম, নাচতে লাগলাম এবং গান গাইতে লাগলাম। তারপর একসময় নিজেকে সংযত করে আমি বিচার করতে লাগলাম, কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছে, আমি পাগল হয়েছি। তখন আমি গুরুদেবের চরণে আমার কথা নিবেদন করলাম। বললাম, 'হে গুরু মহারাজ, আপনি কি মন্ত্র আমাকে দিলেন, সেই মন্ত্র জপ করতে করতে আমি চঞ্চল হয়ে গেছি, পাগল হয়ে গেছি। কৃষ্ণ নামকীর্তনের আনন্দে আমি হাসছি, নাচছি, কাঁদছিও।' তখন সেকথা শুনে গুরুদেব হেসে হেসে বললেন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই স্বভাব যে, যে জপ করবে, তারই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হবে। ১। জাগতিক ধর্ম, ২। অর্থনৈতিক উন্নতি, ৩। কাম উপভোগ এবং ৪। মোক্ষ—এই চারটি হল চতুর্বর্গ, কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ, আসল পুরুষার্থ হল ৫। কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় এই চারটি বস্তু পথের পাশে পড়ে থাকা অতি তুচ্ছ ঘাসের মতোই অর্থহীন হয়ে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে মানুষ ধর্ম আচরণ, অর্থ রোজগার ও কাম উপভোগ করে অবশেষে জগৎটা দুঃখময় জেনে মোক্ষ লাভের আকাংক্ষা করে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হচ্ছে জড়জাগতিক স্তরে ধর্মের চারটি পর্যায়, যা শ্রীমদ্ভাগবতে 'প্রোজ্‌ঝিত ধর্ম' বা ছলধর্ম বলে বর্জিত করা হয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় তাই বলা হয়েছে, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সব ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে চলো। অর্থাৎ জাগতিক কর্তব্য অকর্তব্য নিয়ে, অর্থ রোজগার ব্যাপার নিয়ে, কাম উপভোগ নিয়ে, মুক্তির চিন্তা নিয়ে মাথা

না ঘামিয়ে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে। ভগবানের সেবা চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে। ভগবানের সেবা করার প্রবণতা হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। জীবাত্মা ভগবানের মতোই নিত্য সনাতন। ভগবানের সেবা ভগবানের দিব্য নামের প্রভাবে ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই যথার্থ পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো। তার তুলনায় ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের আনন্দ এক বিন্দুর মতোও নয়। কৃষ্ণনামের ফলে সর্বশাস্ত্রসম্মত প্রেম লাভ হয়। আর সেই কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব হচ্ছে দেহ ও মনে চিন্ময় ক্ষোভের উদ্রেক করা এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভের প্রতি অধিক থেকে অধিকতর লোভের সৃষ্টি করা। কারও চিত্তে প্রেম উদয় হলে, তিনি স্বাভাবিক ভাবে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন, কখনও গান করেন কখনও উন্মাদের মতো দৌড়াদৌড়ি করেন। কীর্তনকারীর শরীরে বারো রকমের অবস্থা বা লক্ষণ ফুটে ওঠে। তার ১) শরীরে ঘাম, ২) কম্প, ৩) রোমাঞ্চ, ৪) চোখে অশ্রু, ৫) বাক্য গদ্‌গদ ৬) অঙ্গ বৈবর্ণ্য, ৭) উন্মাদভাব, ৮) বিষাদভাব, ৯) ধৈর্য, ১০) গর্ব, ১১) হর্ষ, ১২) দৈন্য।

"আমার গুরুদেব আমাকে বললেন, ভাল হল, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন, তুমি নৃত্য করো, ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন কর, তাছাড়া তুমি কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করার মহিমা সম্পর্কে সবাইকে উপদেশ দাও। এভাবে সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধার করতে পারবে। এই বলে গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক বললেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

"কেউ যখন ভক্তিপথে যথার্থ উন্নতি সাধন করেন এবং তাঁর অতি প্রিয় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে আনন্দমগ্ন হন, তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করেন। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন এবং কখনও উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বাইরের লোকেরা কে কি বলে সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান থাকে না।"

গুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য শুনে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস হল। তাই আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করি। সেই কৃষ্ণনামই আমাকে গাওয়ায়, নাচায়। নিজের থেকে আমি তা করি না, নামের প্রভাবে আপনা থেকে তা হয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে যে আনন্দ-অমৃত সিন্ধু আস্বাদন করা যায়। তার তুলনায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির আনন্দ হচ্ছে অত্যন্ত অগভীর খাদের জলের মতো।'

যদিও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল ভগবান সম্বন্ধে তাঁর ভগবানের সবিশেষ ভাবধারা খণ্ডন করে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদটিকে উপস্থাপনা করা। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিনয় নম্রভাবে শাস্ত্র-যুক্তি মাধ্যমে মায়াবাদীদের নির্বিশেষ মতবাদটিকে নস্যাৎ করলেন। এমনকি কেউ যদি মায়াবাদী ভাষ্য শ্রবণ করে, তার সর্বনাশ হবে, তার পারমার্থিক প্রগতি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। শিবের অবতার শঙ্করাচার্য শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশক্রমেই ভগবদ্-বিরোধী লোকের জন্যে মায়াবাদ প্রচার করে অসৎশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তাও মহাপ্রভু ব্যাখ্যা করলেন। মায়াবাদ দর্শনে জীবকে ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদিত হয়েছে। ব্যাসদেব ভ্রান্ত বলেও মন্তব্য করা হয়েছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥

কিছু তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি রয়েছে, যারা প্রশ্ন করে 'নিত্যানন্দ বড়, না গৌরাঙ্গ বড়।' তারা কেউ নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দেন, আবার কেউবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ প্রভু অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বড়, না শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু বড়, সেই বিচার না করে পঞ্চতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সমানভাবে তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সমস্ত ভক্তরাই পূজনীয়। পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্তন করার সময়, অন্য কোন মনগড়া ছড়া না বানিয়ে পূর্ণ প্রণতি নিবেদন করে অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে বলা উচিত—

"জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥"

এই কীর্তনের ফলে নিরপরাধ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের যোগ্যতা লাভের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কালেও পূর্ণরূপে উচ্চারণ করা উচিত—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবী জুড়ে প্রেম বিতরণ করে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে চেয়েছিলেন। প্রকটকালে তিনি সংকীর্তন আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তি প্রচার উদ্দেশ্যে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীকে পাঠালেন বৃন্দাবনে, নিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গদেশে নিযুক্ত করলেন এবং নিজে দক্ষিণ ভারতে গেলেন। পৃথিবী জুড়ে প্রচারকার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ওপর অর্পণ করলেন। সংঘের সদস্যারা যদি চারটি নিয়ম পালন করে আচার্যের নির্দেশ অনুসারে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তা হলে অবশ্যই তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করবেন এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হবে।

সবাইকেই প্রেম প্রদান

সমস্ত অপ্রাকৃত প্রেমের ভাণ্ডার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁর গোলোকধামের যে প্রেমভাণ্ডার জড়জগতে কাউকেই প্রদান করেননি, সেই ভাণ্ডার পঞ্চতত্ত্ব রূপে আবির্ভূত হয়ে কলিযুগের ভাগ্যবন্ত জীবেদের কাছে দান করতে এসেছেন।

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁর প্রেমভাণ্ডার নিয়ে এলেও তা ছিল শীলমোহর দিয়ে রুদ্ধ। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে সেই শীলমোহর ভেঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে সেই প্রেম আস্বাদন করলেন। যত তাঁরা সেই প্রেম রস আস্বাদন করেন, ততই তাঁদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর শরণাগত ভক্তদেরই রক্ষা করেছিলেন, তিনি যে প্রেম লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে কোনও যোগ্যতার অপেক্ষা না করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীরা বুঝেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য কেউ অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম এভাবে প্রদান করতে পারেন না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তা পারেন। এই মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ নন।

পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥

এভাবে পঞ্চতত্ত্ব স্বয়ংই পুনঃপুনঃ সেই ভগবৎ প্রেমামৃত অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সবাইকে পান করাতে লাগলেন। এভাবে প্রত্যেকেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হলেন। এভাবে সকলে উন্মত্তের মতো কাঁদতে লাগলেন, হাসতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন, নাচতে লাগলেন।

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥

কৃষ্ণপ্রেমভক্তি লাভের কে যথার্থ-অধিকারী, কে অধিকারী নয়, কোন্ স্থানে, কোন্ দেশে, কোন্ জাতিতে কৃষ্ণপ্রেম দান করা উচিত, কাকে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে প্রেরণা দেওয়া উচিত? কর্মীকে, জ্ঞানীকে, কিংবা যোগীকে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত কিনা? ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী—কে কৃষ্ণপ্রেম লাভের অধিকারী? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়ার যোগ্য? হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন কোন্ মতাবলম্বী ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হবে? শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক—কে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হতে পারে? বৃক্ষ, পশুপাখী, মানুষ, দেবতা—কে কৃষ্ণভক্তির অধিকারী?—কি গ্রাম, কি শহর, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজনীতিবিদ, কি ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার, কি রাজা, কি ফকির, কি রোগী, কি সুস্থ—সেই সমস্ত কোনও কিছু বিচার না করে—যেখানে যাকেই তাঁরা পেয়েছেন, তাঁকেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করেছেন।

কোনও বস্তু সবার মধ্যে বিতরণ করতে থাকলে, তা হলে সেই বস্তু আর অবশেষ থাকার কথা নয়, কিংবা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেরকম কথা জড়জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, চিন্ময় বস্তু সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। অধিকন্তু কৃষ্ণপ্রেম ভাণ্ডার যতই বিতরণ করা যায়, ততই তা শত শত গুণে বর্ধিত হয়।

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব যদিও সেই প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠন করে, খেয়ে এবং বিতরণ করে তা উজাড় করলেন, কিন্তু তাতে ফুরিয়ে গেল না। পক্ষান্তরে, সেই আশ্চর্য ভাণ্ডার যতই বিতরিত হল ততই তা শত শত গুণে বর্ধিত হল।

অর্থাৎ অনন্ত কোটি জীব যদি কৃষ্ণভাবনাময় হতে চায়, তা হলে ভগবৎ প্রেমের কোন অভাব হবে না এবং তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিরও কোনও অভাব হবে না। মানুষের প্রেমানন্দ বর্ধিতই হবে।

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং সমস্ত অবতারের অবতারী। আর শ্রীবলরাম হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় দেহ। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা বিলাসে শ্রীবলরাম হচ্ছেন তাঁর প্রধান সহায়। সেই আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীবলরাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীবলরাম পাঁচটি রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন—(১) মহা-সংকর্ষণ, (২) কারণতয়োশায়ী মহাবিষ্ণু, (৩) গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, (৪) ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং (৫) শেষ নাগ।

শ্রীবলরাম তাঁর প্রথম চারটি রূপে জড় সৃষ্টির কার্য সম্পাদন করেন এবং শেষ রূপে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ান্ত সেবা অবধি তিনি করেন তাই তার নাম শেষ, কিন্তু অন্তহীনভাবে তিনি ভগবানের সেবা করে চলেন তাই তাঁর নাম অনন্ত।

শ্রীবলরাম হচ্ছেন সেবক-ঈশ্বর। তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদরূপে একই ভাবে সেবা করেন। ভগবানের নিত্য সহচররূপে নিত্য সেবানন্দে মগ্ন থাকেন, তাই তাঁর নাম নিত্যানন্দ।

ব্রহ্মাণ্ড জগতের বাইরে সর্বব্যাপক চিৎ জগত বৈকুণ্ঠলোক হচ্ছে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ধাম। বৈকুণ্ঠ লোকের সর্বোচ্চ ধাম গোলোক। তারপর দ্বারকা। ভগবানের আদি চারপ্রকাশ চতুর্ব্যূহ সেখানে রয়েছেন। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। দ্বারকার সেই চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ বৈকুণ্ঠে বিরাজিত। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এর সংকর্ষণকে বলা হয় মহাসংকর্ষণ। বৈকুণ্ঠে ষড়বিধ ঐশ্বর্য প্রকাশিত। সেই ধাম ও সর্ব ঐশ্বর্য মহাসংকর্ষণের বিভূতি। মহাসংকর্ষণই সমস্ত জীবের আশ্রয়। মহাসংকর্ষণের একটি অংশ প্রকাশ হচ্ছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু। এই মহাবিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। তিনি কারণসমুদ্রে শায়িত থাকেন। চিন্ময় জগতে বৈকুণ্ঠলোকের বহির্ভাগে রয়েছে ব্রহ্মজ্যোতি নামক নির্বিশেষ উজ্জ্বল জ্যোতি। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের বাইরে রয়েছে কারণ সমুদ্র, যা জড়জগৎ

ও চিৎজগতের মাঝখানে অবস্থিত। জড়ব্রহ্মাণ্ড জগৎ সেই কারণ-সমুদ্র থেকে উদ্ভূত। কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু কেবলমাত্র জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে অসংখ্য জড়জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একটি অংশ প্রকাশ মাত্র। সেই মহাবিষ্ণুকে বলা হয় প্রথম পুরুষাবতার। মহাবিষ্ণু শ্বাসত্যাগের সময় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, আবার শ্বাসগ্রহণের সময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় তাঁর শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

এক-একটি ব্রহ্মাণ্ডে সেই মহাবিষ্ণুর অংশ প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অবস্থান করেন। তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন বলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অংশের অংশ বা কলা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ প্রকাশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বভাগে ক্ষীর সাগরে শায়িত। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অংশাতি অংশের অংশ। স্বর্গের দেবতারা সেই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে দর্শন করতে পারেন না। তখন তাঁরা ক্ষীর সাগরের তীরে তাঁর স্তব করেন। বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে জগতে অবতরণ করতে দেবতারা আবেদন করেন। তখন তিনি যুগে যুগে মন্বন্তরে মন্বন্তরে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য নানা রূপে অবতরণ করেন। সেই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর একটি অংশ প্রকাশ হচ্ছেন শেষ বা অনন্তদেব। তিনি সর্পরূপ। তাঁর সহস্র সহস্র ফণা। সেই ফণাসমূহে ভুবনমণ্ডল ধারণ করে রয়েছেন। পঞ্চাশকোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর একটি ফণার ওপরে একটি সর্ষের দানার মতো বিরাজ করে।

সেই অনন্ত শেষ সহস্রবদনে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমা কীর্তন করেন। ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি প্রথম পুত্র চারকুমার সেই অনন্তদেবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। সেই অনন্তদেবই ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, বিশ্রামের আসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি রূপে নিজেকে প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ভগবানের সমস্ত সেবার উপকরণ

নিত্যানন্দেরই বিন্দু বিন্দু অংশ প্রকাশ। যিনি কৃষ্ণের ভাই বলরাম রূপে পৃথিবীতে লীলাবিলাস করেছেন, তিনিই নিত্যানন্দ প্রভু। কলিযুগে তাঁরা গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ রূপে লীলা বিলাস করছেন। তাঁদেরই অংশ প্রকাশ যথাক্রমে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ রূপে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (মধ্য ১০/৩০৮-৩১০) নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিত হয়েছে—

চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥
নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভক্তিতত্ত্ব জানি ॥
সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।
সবে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তি-পদ পায় ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা বিনা আর কিছু জানতে চান না। জগতের জীবকে মহাপ্রভুর সেবা দাস্য নিত্যানন্দ প্রভুই দিয়ে থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরিকে সেই ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয়েছে। ভগবানের প্রতি ভক্তি কতজনের কত রকমের থাকতে পারে, কিন্তু যথার্থ ভক্তি তারই হৃদয়ে জাগরিত হয় যার প্রতি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু প্রসন্ন থাকেন। সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাকে অঙ্গীকার করেন, সেই ভগবানের আনন্দময় সেবারাজ্যের অধিকারী হয়।

যদি কেউ মৃত্যুময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্‌সেবাময় পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হতে অভিলাষ করে, তবে সে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করবে।

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১/৭৭)

শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব

মহাবিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার। তিনি শ্রীহরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব। তাই তাঁর নাম অদ্বৈত। তিনি কৃষ্ণভক্তি শিক্ষক। তাই তাঁর নাম আচার্য। অদ্বৈত আচার্য। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ মঙ্গলময়। তাঁর অন্য নাম মঙ্গল। যে সব মানুষ জগতের জঞ্জালস্বরূপ, তারাই এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝতে না পেরে ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়। কোটি কোটি অংশ, কোটি কোটি শক্তি, কোটি কোটি অবতার নিয়ে মহাবিষ্ণু সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি পালন ও ধ্বংস করেন। সেই মহাবিষ্ণু গৌরপার্ষদ অদ্বৈত আচার্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর আর এক মূর্তিতে অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে ভগবদ্‌ভক্তি প্রবর্তন করলেন। কৃষ্ণভক্তি প্রদান করে সমস্ত জীবদের উদ্ধার করলেন। তিনি ভগবদ্‌ভক্তির আলোকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করলেন। জীবকে ভক্তি উপদেশ দেওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনও কাজ নেই। সর্ববৈষ্ণবদের প্রধান গুরু এবং সমস্ত বৈষ্ণবদের পরমপূজ্য হচ্ছেন অদ্বৈত আচার্য।

তিনি কমলনয়ন পরমেশ্বরের অংশ, তাই তাঁর অন্য নাম কমলাক্ষ। অদ্বৈত আচার্যপ্রভু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করলেন এবং হুংকার করে শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে প্রার্থনা করলেন, তাঁর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হলেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ত্রিভুবনের যাবতীয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারকথা নিত্য কৃষ্ণভক্তি, তা সর্বদা ব্যাখ্যা করেন। চৈতন্যভাগবতে (আদি ২/৮০) সেই কথা উল্লেখ রয়েছে—

ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তিসার' ॥

শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই সবই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, সেই সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত না হয়ে পণ্ডিত-অভিমানী মূঢ় ব্যক্তিরা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার ৷
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর ॥
(চৈঃ চঃ আদি ২/৬০)

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অনাদিরও আদি, সমস্ত কারণের মূল কারণ। অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্। (ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে যত অবতার অবতীর্ণ হচ্ছেন, তাঁরা সবাই পরমেশ্বর ভগবানের অংশাতি অংশকলা মাত্র। তাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হন অসুর দ্বারা প্রপীড়িত বিশ্বকে রক্ষা করতে। সেই সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব অবতারেরা হচ্ছেন পুরুষাবতারদের অংশ ও কলা। কিন্তু আদি পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ কোনও অবতার নন, তিনি অবতারী। সর্ব অবতারের উৎস। তিনি সমস্ত অবতারের অবতারী।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ৷
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥
(ভাঃ ১/৩/২৮)

ভগবানের তিনটি পুরুষাবতার রয়েছে (পুংসঃ)। মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন পুরুষাবতারদের অংশ বা অংশের অংশ বা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। ইন্দ্রের শত্রুদের দ্বারা বিশ্ব যখন প্রপীড়িত হয় (ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং) তখন ভগবান তাঁর সেই সমস্ত অংশ-কলার দ্বারা (অবতারদের দ্বারা) যুগে যুগে বিশ্বকে রক্ষা করেন (মৃড়য়ন্তি)।

শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহ, বরাহ প্রমুখ অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্ব অবতার ব্রহ্মার কল্পে বহুবার অবতীর্ণ হন। কিন্তু অনাদির আদি লীলাপুরুষোত্তম রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কল্পে মাত্র একবার অবতীর্ণ হন।

ব্রহ্মার একদিন বা ১২ ঘণ্টা (৪৩২ কোটি বছর) আর রাত্রিও সমপরিমাণ। দিবাভাগে ১৪ মনু রাজত্ব করেন। চৌদ্দ মনু হলেন (১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষ-সাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি ও (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। এক এক মনুর রাজত্বকাল ৭১ চতুর্যুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ ৭১ বার আবর্তিত হলে এক মন্বন্তর হয়। এরকম ১৪ মন্বন্তরের মধ্যে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ধরাতলে অবতীর্ণ হন সপ্তম মন্বন্তরে (বৈবস্বত) ২৮ নম্বর চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষ ভাগে। ব্রহ্মার প্রতিদিনে (২৪ ঘণ্টার পর) অর্থাৎ ৮৬৪ কোটি বছর অন্তর ধরাতলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একবার আসেন। ব্রহ্মার দিবাভাগের মধ্যে সপ্তম মন্বন্তরে, অর্থাৎ ১৯৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ২০ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ আসেন এই ধরাতলে ব্রজলীলামাধুরী প্রকাশ করতে।

এই কথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

ব্রহ্মারও একদিনে তিঁহো একবার ৷
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি ৷
সেই চারি যুগে এক দিব্যযুগ মানি ॥
একাত্তোর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর ৷
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর ৷
সাতাশ চতুর্যুগে গেল তাহার অন্তর ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ৷
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ৩/৬-১০)

ব্রজ পরিবেশ, ব্রজবাসীরূপে ভগবানের সঙ্গে ভক্তিরস-সম্বন্ধ একটি অদ্ভুত ব্যাপার। পৃথিবীর সর্বত্রই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করে। কিন্তু সেই সবই বিধিভক্তি। বিধিভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ব্রজভূমির ভক্তদের প্রেমভক্তি বা প্রেমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রীভগবান ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভক্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দর্শন করেন। বৈদিক শাস্ত্র থেকে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হয়ে কেউ ভগবদ্‌ভক্তে পরিণত হতে পারেন এবং শাস্ত্র নির্ধারিত বৈধীভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। কিন্তু তার দ্বারা ব্রজবাসীদের নিগূঢ় কৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না। বৈদিক শাস্ত্র নির্ধারিত বিধিভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ব্রজবৃন্দাবনে ভগবানের লীলার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। শাস্ত্রনির্দেশ অনুশীলন করার ফলে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করা যেতে পারে, কিন্তু তার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করা যায় না। ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার অত্যধিক প্রচেষ্টার ফলে ভগবানের সঙ্গে প্রেমময়ী সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই প্রেমময়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে নদীয়াতে প্রকাশিত হতে মনস্থ করেন।

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে বিধিভক্তি অনুশীলন করে লোকে চার প্রকার মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করতে পারে। এই চার প্রকার মুক্তি হল (১) সার্ষ্টি বা ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা, (২) সারূপ্য বা ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া, (৩) সামীপ্য বা ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা ও (৪) সালোক্য বা ভগবানের লোকে বাস করা। আর একটি মুক্তি আছে যা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা আশা করে থাকে, তা হল (৫) সাযুজ্য মুক্তি বা ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া। শেষোক্ত মুক্তি ভক্তরা কখনো পছন্দ করেন না। শুদ্ধভক্তরা অন্য মুক্তিগুলোতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা ভগবানের সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকতেই বাসনা করেন।

জড় জগতে মানুষ একে অপরের সঙ্গে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও দাম্পত্য আদি পাঁচটি সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পর্কিত। এই পাঁচটি সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ অনিত্য জড় আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু জড় জগতে এই পাঁচটি সম্পর্ক হচ্ছে চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য ও পূর্ণ আনন্দময় সম্পর্কের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে জীবের সেই নিত্য সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন। সেইজন্যে তিনি ব্রজধামে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, যাতে মানুষ সেই লীলাবিলাসের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই জড় জগতের সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারে।

কৃষ্ণভক্ত শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উক্তি—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥

পরমেশ্বর ভগবানের সর্বমঙ্গলময় অন্য বহু বহু অবতার থাকতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেই বা তাঁর শরণাগতদের ভগবৎ-প্রেম দান করতে পারেন?

ব্রজের যে প্রেমভাবে ভক্তগণদের দেখা যায়, মা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র জ্ঞানে দড়ি দিয়ে বেঁধে শাসন করেন, সখাগণ কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেন, প্রিয়াগণ কৃষ্ণের প্রতি মান করেন, আর কৃষ্ণ তাঁদের প্রেমভক্তিতে বাঁধা পড়েন।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই যে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

হে পার্থ! আমার ভক্তরা যেভাবে আমার কাছে প্রপত্তি করে, সেইভাবেই আমি তাদের অনুগ্রহ করি। সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার প্রদর্শিত

পথে অনুগমন করে। (গীতা ৪/১১) কেউ যখন তাঁকে পুত্র, সখা বা প্রেমাস্পদ বলে মনে করে শুদ্ধ ভক্তিযোগে তাঁর সেবা করে তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বশীভূত হন।

ভক্তি তিন রকমের—(১) সাধারণ ভক্তি ঃ ভগবানের সেবা করতে হয়, বা করা উচিত, তাই করা হচ্ছে। (২) মিশ্রভক্তি ঃ সকাম কর্ম, মনগড়া ভাবনা, ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে জড়জাগতিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ভক্তি এবং (৩) শুদ্ধ ভক্তি ঃ প্রেমের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি।

শুদ্ধভক্তিতে ভগবান আকৃষ্ট হন। শুদ্ধভক্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট।

কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তা হলে সে অবশ্যই জড়সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পাপ-পুণ্যের কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করে জাগতিক বন্ধনে বদ্ধ থাকবে। কৃষ্ণচেতনাই জীবনের পরম পূর্ণতা। সেজন্য বদ্ধ জীবদের মধ্যে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি চেতনা প্রদানের জন্য ভক্তিভাব অবলম্বন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হন।

মহাভারতের দানধর্মে, বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে পরমেশ্বর ভগবানের রূপগুণের বর্ণনা করা হয়েছে, এভাবে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

১। সুবর্ণবর্ণ—সোনার মতো উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি।

২। হেমাঙ্গ—শুধু সোনার মতো নয়, তপ্ত বা গলিত সোনার মতো অঙ্গ।

৩। বরাঙ্গ—অপূর্ব সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ।

৪। চন্দনাঙ্গদী—চন্দনে চর্চিত অঙ্গ।

৫। সন্ন্যাসকৃৎ—সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণকারী।

৬। শম—শমগুণ সম্পন্ন। এরও দুটি অর্থ, ১) গূঢ় ভগবৎতত্ত্ব বর্ণনাকারী, ২) কৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও প্রেমদানকারী।

৭। শান্ত—ধীর, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য বিষয়ে উদাসীন।

৮। নিষ্ঠা—ভক্তির পরম আশ্রয়।

এই সমস্ত বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকেই নির্দেশ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের একত্রিশ শ্লোকে কলিযুগের আরাধ্য ভগবান সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

কলিযুগের যাঁরা সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁরা অবশ্যই নাম সংকীর্তন যজ্ঞ দ্বারা, সেই কৃষ্ণ যিনি অ-কৃষ্ণ বা গৌররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর আরাধনা করবেন। সেই ভগবান সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তন অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।

শ্রীকরভাজন ঋষির এই উক্তিতে ভগবানের যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই নির্দেশ করে—

১। কৃষ্ণবর্ণ—'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। কিংবা কৃষ্ণমহিমা যিনি বর্ণনা করছেন। বাস্তবিক কৃষ্ণ ছাড়া যাঁর মুখে অন্য কিছু আর আসে না। যদি কেউ বলেন যে, কৃষ্ণবর্ণ বলতে তাঁর অঙ্গের বর্ণ কৃষ্ণ, সেটি ঠিক নয়, কেননা পরবর্তী বিশেষণেই তা নিবারণ করে বলা হয়েছে (ত্বিষা অকৃষ্ণম্) 'অঙ্গকান্তি কৃষ্ণ বা কালো নয়'।

২। ত্বিষাঽকৃষ্ণ—অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ, অর্থাৎ বিপরীত। তাঁর অঙ্গকান্তি গৌর।

৩। স-অঙ্গ—অঙ্গ মানে অংশ। ভগবানের অংশপ্রকাশ বিষ্ণুতত্ত্ব অবতার। তাঁরাও সঙ্গে থাকেন 'সাঙ্গ'। 'অদ্বৈত, নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।'

৪। উপাঙ্গ—সেবক বা শুদ্ধভক্তবৃন্দকে বুঝায়। 'শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ'।

৫। পার্ষদ—অন্তরঙ্গ ভক্ত, ভগবৎশক্তিকে বুঝায়। শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রমুখ ভক্ত।

৬। অস্ত্র—কলির কলুষ নাশক অস্ত্র অর্থাৎ হরিনাম—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র।

এই সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীগৌরহরিকে বুদ্ধিমান মানুষেরা ভজনা করবেন। যজন্তি হি সুমেধসঃ।

অথর্ববেদে চৈতন্য উপনিষদ খণ্ডে কলিযুগের আরাধ্যপুরুষ সম্বন্ধে মহর্ষি পিপ্পলাদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার যে উক্তি তা হল এই—

জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যো ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীত—সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।

অর্থাৎ, "সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মস্বরূপ, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত সত্ত্বময় দ্বিভুজ গোবিন্দ স্বয়ং জাহ্নবীতীরে গোলোকস্বরূপ নবদ্বীপ ধামে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ভক্তি প্রকাশ করবেন।"

এই উক্তিটি একমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই নির্দেশ করে।

১। জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে—কলিযুগে ভগবানের আবির্ভাব নবদ্বীপধামে জাহ্নবীর তীরে।

২। গোলোকাখ্যো ধাম্নি—বৈকুণ্ঠজগতের সর্বোচ্চলোক গোলোক বৃন্দাবন ধাম। স-পার্ষদ স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ ভগবান।

৩। গোবিন্দ দ্বিভুজ—আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ হচ্ছে দ্বিভুজ মুরলীধর। প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন ভগবান চতুর্ভূজ বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু অনাদিরাদি কৃষ্ণ দ্বিভুজ যিনি সবাইকে আনন্দ প্রদান করবার জন্য অবতীর্ণ, তাঁরই নাম গোবিন্দ। ব্রহ্মা বলছেন তিনি কলিতে আবির্ভূত হচ্ছেন নবদ্বীপে।

৪। গৌর—গোবিন্দের অঙ্গকান্তি জলভরা মেঘের মতো কাজলবর্ণ। কিন্তু সেই গোবিন্দ এখানে গৌরসুন্দর রূপে আবির্ভাব।

৫। সর্বাত্মা—সর্বজীবের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। যে জীবাত্মা তাঁকে দর্শন করে, সে-ই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন।

৬। মহাপুরুষ—তিনি আরাধ্য মহাপুরুষ। মহাপুরুষের ৩২টি লক্ষণই (জ্যোতিষবিজ্ঞান) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে পরিলক্ষিত হয় —

১) পাঁচটি অঙ্গ (নাক, বাহু, চিবুক, চক্ষু, জানু) দীর্ঘ।

২) পাঁচটি অঙ্গ (ত্বক, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দাঁত, রোম) সূক্ষ্ম।

৩) সাতটি অঙ্গ (চক্ষু, পদতল, করতল, মুখের তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ) রক্তিম।

৪) ছয়টি অঙ্গ (বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কোমর, মুখ) উন্নত।

৫) তিনটি অঙ্গ (গ্রীবা, জঙ্ঘা, মেহন) হ্রস্ব বা খর্বাকৃতি।

৬) তিনটি অঙ্গ (কটিদেশ, ললাট ও বক্ষ) বিস্তীর্ণ বা চওড়া।

৭) তিনটি অঙ্গ (নাভি, স্বর, স্বত্ব) গম্ভীর।

শুধু তাই নয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করতল ও পদতলে বজ্র, ধ্বজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, রথ, মীন, অঙ্কুশ, অম্বর, কুঞ্জর, অশ্ব, বৃষ, ধনু, শক্তি ইত্যাদি বিবিধ রকমের মঙ্গলময় চিহ্নও বিদ্যমান।

৭। মহাত্মা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই সবকিছুর কারণ এটি যে তত্ত্বগতভাবে বুঝতে পেরে তাঁর শরণাগত হন তিনিই মহাত্মা। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যন্তে, বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা রূপে জগতে প্রকাশিত।

৮। মহাযোগী—পরম ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে মহাযোগী বলা হয়। (ভাগবত ১০/১২/৪২) আবার সর্বব্যাপক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও মহাযোগী বলা হয়। (ভাগবত ১০/১৯/১৩) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যুগপৎ দুইই।

৯। ত্রিগুণাতীত—সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের উর্ধ্বে। ত্রিগুণাত্মক বলতে জড়জীবনকে বোঝায়। ত্রিগুণাতীত বলতে কৃষ্ণচেতনাময় জীবনকে বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ চেতনাময়ের মূর্তিমন্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

১০। সত্ত্বরূপ—যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিগুণের অতীত, তবুও লোকশিক্ষার নিমিত্ত সাত্ত্বিক আচরণ প্রদর্শন করতেন। সত্ত্বরূপ বলতে 'আনন্দময়' বোঝায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মগ্ন থাকেন।

১১। ভক্তিং লোকে কাশ্যতি—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই জগৎসংসারে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি কিভাবে করতে হয় তা স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দেন। তিনিই ভক্তিপ্রকাশক ভগবান।

উপপুরাণে শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীহরির উক্তি এরকম—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্ ॥

"হে ব্রাহ্মণ! কখনও কখনও অবশ্যই আমি কলিযুগের অধঃপতিত পাপী মানুষদের হরিভক্তি প্রদান করার জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করি।"

১। ক্বচিদ্—কখনও কখনও। অর্থাৎ, প্রতি কলিযুগে ভগবান হরিভক্তি প্রদান করবার জন্য আসেন না। ব্রহ্মার কল্পে একবার বিশেষ কলিযুগেই তিনি আসেন।

২। সন্ন্যাস আশ্রম আশ্রিত—সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে। যদিও কলিযুগে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ, তবুও তথাকথিত সন্ন্যাসী সহ সর্বস্তরের মানুষকে হরিভক্তি শিক্ষা দিতে ভগবান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

৩। হরিভক্তি গ্রাহয়ামি—তিনি স্বয়ং শ্রীহরি। কি করে হরিভক্তি অনুশীলন করতে হয়, তা তিনি শিক্ষা দান করবেন।

৪। কলৌ পাপহতান্ নরান্—কলিযুগের পাপাচারী মানুষেরা দুর্মতি বশত স্বভাবতই ভক্তি গ্রহণ করে না। তবুও করুণাময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিভক্তি প্রদান করে তাদের উদ্ধার করতে আসেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' (১/২) গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

"উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের ভক্তিসম্পদ পূর্বে বহুকাল পর্যন্ত যা অর্পিত হয়নি, সেই বস্তু দান করবার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন।"

১। অনর্পিত চরীং চিরাৎ—(বহুকাল পর্যন্ত অর্পিত হয়নি) পরমেশ্বর ভগবান যে 'প্রেমভক্তি' ব্রহ্মার দিনের মধ্যে (এক কল্পে) কেবলমাত্র একবার দিতে আসেন এই জগতের মানুষকে। ব্রহ্মার এক দিবসে অর্থাৎ চৌদ্দ মন্বন্তরের মধ্যে কোনও মন্বন্তরেই নয়, একমাত্র বৈবস্বত বা সপ্তম মন্বন্তরে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগে প্রেমভক্তি দান করতে ভগবান শ্রীহরি অবতীর্ণ হন।

২। করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ (করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ)—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—কোনও যুগেও মানুষ সেই প্রেমভক্তি লাভ করতে পারে না, অন্য কলিযুগে তো নয়ই, কেবলমাত্র এই মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগেই ভগবানের মহা করুণাময় রূপের আবির্ভাব ঘটে।

৩। সমর্পয়িতুম্ উন্নত উজ্জ্বল রসাম্ (উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তিসম্পদ দান)—ভগবান সচরাচর প্রেমভক্তি দান করেন না। কিন্তু সকাম কর্ম ও মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যতদিন পর্যন্ত না কেউ প্রেমভক্তি লাভ করছে, ততদিন পর্যন্ত জীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভক্তরা ভগবানের আরাধনা করে থাকেন, কিন্তু বিধিভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ব্রজধামের ভক্তদের প্রেমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই ব্রজের প্রেমভাবকেই বলা হয়েছে উন্নত উজ্জ্বল রস। সেই ভক্তিরত্ন স্বয়ং ভগবান এই ধন্য কলিযুগের মানুষদের দান করতে এসেছেন।

৪। স্বভক্তিশ্রিয়ম্—(নিজভক্তি সম্পদ) প্রেমপুরুষ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্তি সম্পদ, উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তি দান করবার জন্যে এই বর্তমান কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। যে ভক্তি তিনি কোনও অবতারে

কখনও দান করেন না। সর্ব অবতারে ধর্ম সংস্থাপন ও অসুর মারণ লীলা করেছেন। কিন্তু নিজভক্তি সম্পদ দান করেননি।

৫। হরিঃ পুরট সুন্দর কদম্ব সন্দীপিতঃ—পরমেশ্বর শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ যাঁর অঙ্গকান্তি পুরট বা স্বর্ণ থেকেও অধিক সুন্দর দ্যুতি সমূহে সমুদ্ভাসিত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি কাজলবর্ণ, কিন্তু তিনি এই কলিযুগে স্বর্ণবর্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

৬। সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরত বঃ শচীনন্দনঃ—সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা আমাদের হৃদয়মধ্যে স্ফুরিত হোন। সেই গৌরহরিই আমাদের চিরজীবনের পরম লক্ষ্য বস্তু হোন। আমাদের হৃদয়ে আর অন্য কিছুর দরকার নেই, কেবল শচীনন্দন থাকলেই সমস্ত অভাব চিরতরে দূরীভূত হবে।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চায় উল্লিখিত হয়েছে—

রাধা [illegible]
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

"শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার। তিনি হ্লাদিনী নামে ভগবানের স্বরূপ শক্তি। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকার। শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।"

১। হ্লাদিনীশক্তি—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করান এবং তাঁর ভক্তদের পোষণ করেন। পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দের মূর্ত প্রকাশ এই হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তিসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান। ভগবৎ

প্রেম হচ্ছে ভগবানের আনন্দদায়িনী বা হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। ভক্তির মাধ্যমে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে যে ভগবৎ প্রেমের বিনিময় হয়, তা হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। সেই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীভগবানকে সবরকম দিব্য আনন্দ আস্বাদন করান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে প্রেমভক্তি সঞ্চার করেন।

হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়ার নাম প্রেম। সেই প্রেম দুই প্রকার ঃ শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম এবং মিশ্র ভগবৎ প্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনী শক্তি যখন কৃষ্ণকে আনন্দ দান করে জীবকে কৃপা করেন, তখন জীবের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। আবার, সেই হ্লাদিনী শক্তি যখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে না। তখন জীব বিষয়বাসনায় মত্ত হয়ে কৃষ্ণপ্রেম থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সময় জীব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হওয়ার পরিবর্তে জড় সুখভোগের প্রতি উন্মত্ত হয় এবং জড়াপ্রকৃতির গুণের সংসর্গের ফলে দুঃখময় জড়জগতে আবদ্ধ হয়।

হ্লাদিনী শক্তির বিশুদ্ধ ক্রিয়ার প্রকাশ হচ্ছে ব্রজগোপিকাদের কৃষ্ণপ্রেম, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তির সার হচ্ছে প্রেম। প্রেমের সার হচ্ছে ভাব। ভাবের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে মহাভাব। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সেই মহাভাব স্বরূপিণী। শ্রীমতী রাধারাণীই বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের মূর্ত প্রকাশ। তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আশ্রয়স্বরূপা। কৃষ্ণময়ী রাধারাণী জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোনও জীব নন। তিনি ভগবানের আনন্দদায়িনী অন্তরঙ্গা শক্তির মূর্ত প্রকাশ। সমস্ত লক্ষ্মী তাঁরই অংশপ্রকাশ মাত্র।

২। একাত্মনৌ অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ—রাধারাণী হচ্ছেন পূর্ণ শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ শক্তিমান। তাঁদের দুজনের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। অগ্নি ও উত্তাপের মতো তাঁরা অভিন্ন। তাঁরা সর্বদা এক। তবুও লীলারস আস্বাদন করার জন্য তাঁরা দুই ভিন্ন রূপ ভিন্ন দেহ ধারণ করেছেন।

৩। চৈতন্য-আখ্যম্ প্রকটম্ অধুনা তৎ দ্বয়ম্ ঐক্যম্ আপ্তম্—শ্রীরাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে একদেহ ধারণ করে প্রকটিত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য নামে।

৪। রাধাভাব দ্যুতি সুবলিতম্ কৃষ্ণস্বরূপম্—শ্রীরাধারাণীর প্রেমভক্তিভাব এবং রাধারাণীর অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দান করার জন্য।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমাজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

"শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি রকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কি রকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করে, সেই সুখই বা কি রকম—এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন।"

ভক্তজনের উদ্দেশ্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন,—এক সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরে বিবেচনা করেন, "সকলেই বলে যে, আমি পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণরসের মূর্ত বিগ্রহ। সমস্ত জগৎ আমার থেকে আনন্দ লাভ করে। এমন কেউ কি আছে যে আমাকে আনন্দদান করতে পারে? আমার থেকে যার মহিমা শত শত গুণে অধিক, সেই কেবল আমার মনকে আনন্দিত করতে পারে। কিন্তু এই জগতে আমার থেকে অধিক গুণসম্পন্ন কাউকে পাওয়া অসম্ভব। তবে কেবলমাত্র রাধারাণীর মধ্যেই তা রয়েছে বলে আমি অনুভব করি। যদিও আমার সৌন্দর্য কোটি কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যকে পরাভূত করে, যদিও আমার এই সৌন্দর্যের সমান অথবা আমার থেকে অধিক সৌন্দর্য সম্পন্ন আর কেউই নেই এবং

যদিও আমার এই সৌন্দর্য ত্রিভুবনের আনন্দ বিধান করে, তবুও রাধারাণীকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার বংশীগীত ত্রিভুবনকে মোহিত করে, কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীর মধুর বচন শুনে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় মোহিত হয়। যদিও আমার অঙ্গগন্ধ সমস্ত জগৎকে সুরভিত করে, তবুও রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গের গন্ধ আমার চিত্ত ও হৃদয়কে হরণ করে। যদিও আমার রসে সমস্ত জগৎ সরস হয়েছে, তবুও শ্রীরাধারাণীর অধরের সুধা আমাকে বশীভূত করে। যদিও আমার স্পর্শ কোটি চন্দ্রের থেকে শীতল, তবুও শ্রীরাধারাণীর স্পর্শ আমাকে সুশীতল করে। যদিও আমার রূপ গুণ সমগ্র জগতের সুখের কারণ, তবুও আমার রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবন স্বরূপ।

এভাবে শ্রীরাধারাণীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনুভব করতে পারলেও, যখন বিচার করে দেখি, তখন সব বিপরীত বলে প্রতিভাত হয়। শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে গেলেও সে আমাকে দর্শন করে অধিক সুখ অনুভব করে। আরও বেশী মোহিত হয়ে উন্মত্ত হয়ে যায়, মূর্ছাগ্রস্ত হয়। আমাকে না দেখেও আকাশে জলভরা মেঘ দেখেও সে মনে করে আমার রূপ অমনি সে মোহিত হয়। শ্রীরাধার মধুর বচন শুনে আমি আকৃষ্ট হলেও, আমার বেণুরব শুনে সে চেতনা হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের ফলে যে বংশীধ্বনির মতো শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনেই সে চেতনা হারায়, কারণ সে মনে করে সেটি আমার বংশীধ্বনি। রাধাস্পর্শ আমাকে সুশীতল করলেও, রাধারাণী আমাকে স্পর্শ করে আরও বেশী সুখ পায়। শুধু তাই নয়, একটি তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে সে ভুল করে মনে করে যেন সে আমাকে আলিঙ্গন করেছে এবং বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেই মনে ভাবে তার জন্ম সার্থক হল তাতেই সে কৃষ্ণসুখে মগ্ন থাকে। অনুকূল বায়ু যখন আমার অঙ্গগন্ধ শ্রীরাধারাণীর কাছে নিয়ে যায়, তখন সে প্রেমে অন্ধ হয়ে সেই বায়ুতে উড়ে যেতে চায়।

আমি যত না সুখী হই, আমার থেকে রাধারাণী আর বহুগুণে অধিক সুখী হয়। আমার মধ্যে এমন কোনও রস আছে, যা আমার মোহিনী শ্রীমতী রাধারাণীকেও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে। আমার থেকে রাধারাণী যে সুখ পায়, সেই সুখ আস্বাদন করার জন্য আমি সর্বদাই উন্মুখ হয়েছি। নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই রস আমি আস্বাদন করতে পারিনি। উপরন্তু সেই সুখমাধুর্য লাভের জন্য আমার লোভ বেড়ে যায়। সেই রস আস্বাদন করার জন্য আমি অবতীর্ণ হবো। বিবিধ প্রকারে আমি শুদ্ধ প্রেমের রস আস্বাদন করব এবং রাগমার্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভক্ত যে ভক্তি করে, তা আমি লীলা-আচরণের দ্বারা শেখাবো।

আমার তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মেছে—১। আমার রাধার প্রেমের মহিমা কিরকম? ২। রাধা সেই প্রেমদ্বারা আমার যে মাধুরী আস্বাদন করে, সেই মাধুর্য বা কিরকম? ৩। আমার মাধুর্য আস্বাদন করে রাধা যে সুখ অনুভব করে, সেই সুখই বা কিরকম? তাই রাধারাণীর প্রেমভাব, রাধারাণীর অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে আমি অবতীর্ণ হবো। যাতে আমার এই তিন বাসনা পূর্ণ হয়।

এই বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ধারণ করে শচীমাতার কোলে আবির্ভূত হলেন। লোভাৎ তদ্ ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বললেন—

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধারাণীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে তাঁর তিন বাসনা পূর্ণ করার জন্য মন স্থির করলেন, সেই সময়ে যুগাবতারের আবির্ভাবের সময় হল। আর সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য নিষ্ঠাভরে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের হুঙ্কার শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করল। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর পিতা-মাতা ও গুরুজনদের অবতরণ করালেন। তারপরে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে

নিজে নবদ্বীপে শচীমাতার কোলে প্রকাশিত হলেন। কলিযুগের ধর্ম হরিনাম সংকীর্তন এবং কৃষ্ণভক্তি শিক্ষাও প্রচার করলেন।

অনন্ত সংহিতা শাস্ত্রে শ্রীমহাদেব পার্বতীদেবীকে বললেন—

য এব ভগবান কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি ॥

হে মহেশ্বরী, যিনি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রাণবল্লভ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর, সেই জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে আবির্ভূত হন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে (১৩০ শ্লোক) উল্লেখ করেছেন—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরম রস চমৎকার মাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥

কে জানত যে পরম পুরুষার্থ হচ্ছে প্রেম? প্রেম নামক পরম পুরুষার্থের সন্ধান, যা পূর্বে কারও শ্রবণগোচর হয় নি। কেই বা হরিনামের মহিমা জানত? শ্রীবৃন্দাবনের মহামাধুরীর মধ্যে কারই বা প্রবেশ করার যোগ্যতা ছিল? পরমচমৎকার পরমপূজনীয় মহাভাবময় মাধুর্যরসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপা শ্রীরাধারাণীর মহিমা পূর্বে কোন্ ব্যক্তিটি জানত? একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্যলীলা প্রকট করে এই সমস্ত আবিষ্কার করেছেন।

শ্রীগদাধর তত্ত্ব

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

গদাধর পণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি ।
তাঁ' সবার চরণে মোর সহস্রপ্রণতি ॥

ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিদের শ্রীপাদপদ্মে আমি শতসহস্র প্রণতি নিবেদন করি, যাঁদের মধ্যে শ্রীগদাধর প্রভু হচ্ছেন প্রধান।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীল কবিকর্ণপূর বর্ণনা করেছেন—

শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী ।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥

কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীই গৌরলীলায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

শৈশব থেকেই গদাধর নিমাইয়ের সঙ্গে খেলাধূলা ও পড়াশুনা করতেন। নিমাই দুরন্তপনা, পাণ্ডিত্য আর তর্ক নিয়ে থাকলেও গদাধর ছিলেন পরম শান্ত। মৃদুভাষী। গয়া থেকে ফিরে এসে নিমাইপণ্ডিত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে কৃষ্ণপ্রেমবিকার প্রকাশ করলে, তা দেখে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্রন্দন করতে করতে মূর্ছিত হলেন। মহাপ্রভু তখন গদাধরকে সুস্থ ও প্রীতি করে বললেন—

'প্রভু বলে—গদাধর! তুমি সে সুকৃতি ।
শিশু হইতে কৃষ্ণেতে করিয়া দৃঢ় মতি ॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে ।
পাইনু অমূল্য নিধি, গেলা দৈব দোষে ॥

কখনও বা মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলতেন, আমার কৃষ্ণ কোথায়? গদাধর উত্তর দিতেন, তোমার অন্তরে। তখন মহাপ্রভু নিজ বক্ষোদেশ নখ দিয়ে বিদীর্ণ করতে চাইতেন, কিন্তু গদাধর তাঁকে নিবৃত্ত করে বলতেন, আর কিছুক্ষণ শান্ত থাকো, তাহলে কৃষ্ণ এখনই এসে

উপস্থিত হবেন। শচীমাতা তখন বলতেন, বাবা গদাধর, তুমি সবসময় আমার নিমাইয়ের কাছে থাকো বাবা। আমি ওকে যে সামলাতে পারি না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করলে গদাধরও সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে থাকলেন। মহাপ্রভু তাকে গোপীনাথ বিগ্রহের পূজার ভার দেন। তাঁকে শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র যেতে নিষেধ করেন। প্রায় দিনই গদাধর পণ্ডিতের ভাগবত পাঠ শুনতে যেতেন মহাপ্রভু। গদাধরের চোখের জলে ভাগবতের পাতা ভিজে গিয়ে লেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে গদাধরও সঙ্গে যেতে চাইলেন। মহাপ্রভু বললেন, গোপীনাথ সেবা এবং ক্ষেত্র সন্ন্যাস এই দুটি শর্ত ভঙ্গ করা চলবে না। কিন্তু গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর বিরহে কাতর হয়ে প্রেমবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলেছিলেন, তোমার দর্শনে কোটি গোপীনাথের সেবা হয়, আর তুমি যেখানেই থাকো সেটাই আসল ক্ষেত্র। এরকম কথায় মহাপ্রভু বললেন, গদাধর, তুমি তোমার সুখের জন্য আমার সঙ্গে যেতে চাইছ, কিন্তু আমি দুঃখিত তোমার গোপীনাথসেবা ও ক্ষেত্র সন্ন্যাস ব্রত ভঙ্গ হওয়ার আশংকায়। গদাধর তখন বলেছিলেন, আমি মায়াপুরে শচীমাতার কাছে চলে যাব। তোমার সঙ্গে যাবো না। মহাপ্রভু তখন বললেন, গদাধর আমার উত্তরে আর কথা বলো না, তুমি ক্ষেত্রে থাকো। মহাপ্রভু চলে গেলে গদাধর মূর্ছা গেলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গদাধরকে শান্ত্বনা দিয়ে সুস্থ করে নিয়ে আসেন।

শ্রীবাস তত্ত্ব

শ্রী বা সৌভাগ্য লক্ষ্মী যাঁর কাছে বাস করেন তিনিই শ্রীবাসতত্ত্ব। শুদ্ধভক্তি যেখানে ভাগ্যশ্রী সেখানে। ভগবান সেখানে। ভাগ্যবান ব্যক্তিই ভগবানের ভক্ত হন।

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৯০শ্লোকে কবি কর্ণপূর উল্লেখ করেছেন—

শ্রীবাস পণ্ডিত ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ ।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি শ্রীনারদমুনি, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবাস পণ্ডিত।

'ধীমান্' কথাটির অর্থ হল 'ভক্তিতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি'।

শ্রীনারদমুনি সারা ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভগবানের শুদ্ধভক্ত। সর্বশাস্ত্রে যত ভক্ত দেখা যায় ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি, সকলেই শ্রীনারদমুনির কৃপাপ্রাপ্ত। শ্রীনারদমুনির কৃপাগুণে তাঁর শিষ্য শ্রীব্যাসদেব লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আমাদের মতো বদ্ধজীবের হাতেও পৌঁছায়। তিনি ভাগবত পরম্পরার গুরু। শ্রীব্রহ্মার হৃদয় থেকেই নারদমুনির জন্ম। শ্রীনারদমুনি সর্বদা কৃষ্ণলীলা দর্শন করেন। কৃষ্ণনামানন্দে সর্বদা উৎফুল্ল। তিনি সর্বদুঃখ ক্লেশ গ্লানির ঊর্ধ্বে বিরাজিত। তিনিই কৃপাদৃষ্টি প্রদান করে সংসারক্লিষ্ট জীবদের উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন।

শ্রীনারদমুনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার (ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট) হলেও তিনি জীবতত্ত্ব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব নন। পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত লীলাকে পরিপুষ্ট করা ও লীলাতে বৈচিত্র্য আনাই তাঁর কাজ। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রতি রাত্রে শ্রীগৌরহরি ও নিত্যানন্দপ্রভু অন্যান্য ভক্তসঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করতে থাকেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সারা পরিবারই কৃষ্ণনামে মেতে থাকেন। কৃষ্ণভক্তিতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি শ্রীবাস ঠাকুর সবাইকে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে ভগবানের নিত্য মঙ্গলময় আশীর্বাদ লাভ করা যায়। শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো শুদ্ধভক্তের গৃহেই ভগবান নামসংকীর্তন নৃত্য ও মহাপ্রকাশ লীলা প্রদর্শন করেন।

শ্রীচৈতন্য স্তুতি

মহাপণ্ডিত শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীনীলাচল পুরীধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়্ভুজরূপ দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলছেন—

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

বৈরাগ্য, জ্ঞান, নিজ ভক্তিযোগ প্রচার করবার জন্য সেই অদ্বিতীয় আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, পরম দয়ালু সেই প্রভুর চরণে শরণাপন্ন হই।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

যে ভগবান কালপ্রভাবে তিরোহিত স্বকীয় ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁর শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়রূপে আসক্ত হোক।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমাসূচক স্তব করেছেন—

১। যিনি ব্রজপতিকুমার স্বরূপ নিজেকে রাধাপ্রেমমাধুরী আস্বাদন করাবার জন্য এবং সীমাহীন অদ্ভুত উদারতা প্রকাশ করে জগৎকে বিশুদ্ধ নিজপ্রেমের উন্মাদমধুর অমৃত লহরী দান করবার জন্য নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য রূপে প্রকটিত হয়েছিলেন, আমরা তাঁর স্তব করি।

২। যে ব্যক্তি ধর্মের ধারে পাশেও নেই, যাদের মন সর্বদা মহাপাপ করতে উৎসুক, যারা সাধুদর্শনেও বঞ্চিত, যারা কোনও দিন সাধুগৃহে কিংবা মন্দিরের মহোৎসবেও যোগদান করেনি, তাদেরকেও শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু সীমাহীন পরমাদ্ভুত ঔদার্য প্রকাশ করে কৃষ্ণপ্রেমরস সুধা দান করেছেন। আর সেই সব লোকও প্রেমানন্দে নাচছে, গাইছে, লুটোচ্ছে। সেই অনির্বচনীয় করুণাময় প্রভুর স্তব করি।

৩। পরম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বড়ই দুর্লভ। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মে কুশল ব্যক্তিরা তা লাভ করতেও পারেন না। ধ্যানে, অষ্টাঙ্গ যোগে তা জানা যায় না। বৈরাগ্যে, কর্মফল ত্যাগে, ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানে, স্তব গান করে তা হৃদয়ঙ্গম যোগ্য হয় না। বেশী কি কথা, শ্রীগোবিন্দের প্রেমভাজন ব্যক্তিরাও পরম উৎকণ্ঠিত চিত্তে যাঁর অন্বেষণ করেন, সেই একান্ত দুর্লভ প্রেমসম্পদ কেবল হরিনাম গ্রহণ মাত্রই প্রাদুর্ভূত হয়েছিল যাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীগৌরহরিকে স্তব করি।

৪। যে একবার শ্রীগৌরহরিকে দর্শন করেছে, তারই প্রাণ শ্রীগৌরচরণে লুটিয়ে পড়েছে। পরমকরুণাময় গৌরহরি তাঁকে বুকে গ্রহণ করে প্রেম দান করেছেন। দূর থেকে যদি কেউ তাঁর নাম কীর্তন, তাঁর মহামাধুর্যময় মূর্তি স্মরণ, কিংবা ভক্তি সহকারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছে, তাকেই তিনি সর্বপ্রেমসার গোপীপ্রেম দান করেছেন। সেই পরমবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তব করি।

৫। যে ভাগ্যবান শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছে, সে প্রেমভক্তি বিনা মোক্ষকেও নরক বলে মনে করে, স্বর্গলোকের সুখকেও অর্থহীন বলে জ্ঞান করে। নিরবধি ব্রজপ্রেমের মাধুরী আস্বাদনে মগ্ন থাকায় ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ ইত্যাদি তার কাছে কীটভোগ্য তুল্য তুচ্ছ বলে মনে হয় যাঁর কৃপাতে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তব করি।

৬। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপদ্মের প্রেমমধুর ধারা যে ভক্তগণই পান করেন, দেবতাগণ সেই ভক্তদের বন্দনা করেন। সেই ভক্তগণ কাউকে উপহাস করেন, কাউকে অবমানন করেন, কাউকে ধিক্কার দান করেন, যাঁর চরণকমলের মধুতে মত্ত হয়ে সেই গৌরচন্দ্রকে স্তব করি।

৭। জীবের কল্যাণের জন্য নানা অবতারে ভগবান এসে কখনও রাক্ষস কিংবা দৈত্যকুল নিহত করে ধর্মের পালন করেছেন, কখনও বা যোগাদি প্রকাশ করে জীবের নিবৃত্তিপথে যাওয়ার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন, কখনও বা সৃষ্টিলীলার দ্বারা জীবকে করুণা করেছেন, কখন বা ধরণীকে উদ্ধার করে জীবের ভয় দূর করে তাদের সুস্থ করেছেন। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত উজ্জ্বল রসময় ব্রজপ্রেম সর্বজীবের সহজলভ্য করেছেন যে মূর্তিতে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্তব করি।

৮। কোটি কোটি চন্দ্রকে পরাভূত করে যাঁর শ্রীবদনের কান্তি, প্রেমানন্দ সাগরের চন্দ্ররূপে যিনি জগৎ প্রেমময় করেছেন, যাঁর স্নিগ্ধ হাস্য থেকে কোটি পূর্ণিমাচন্দ্রের সুধামাখা কিরণধারা ঝরে পড়ছে সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করি।

৯। প্রেম নামক পুরুষার্থ একমাত্র যাঁর চরণপদ্মের ভক্তি থেকে লাভ করা যায়, যিনি প্রেমরাশি দান করে জগৎ মঙ্গলেরও মঙ্গল বিধান করেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করি।

১০। যিনি অদ্ভুত নৃত্যছন্দে কর-চরণ সঞ্চালিত করছেন, স্বর্ণ অর্গল সদৃশ বাহু দুটি উর্ধ্বে তুলে মনোহর নৃত্য ভঙ্গীতে শ্রীঅঙ্গ দোলায়িত করছেন, যাঁর নয়নদুটি প্রফুল্ল কমল থেকেও সুন্দর, যিনি আনন্দে 'হরি হরি' উচ্চারণ করে বিশ্বের নিখিল অমঙ্গল নাশ করছেন, সেই অতুল রসাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করি।

১১। যিনি আনন্দলীলাময়, যিনি রাধারাণীর হেমকান্তিতে নিজের শ্যামলকান্তি আবৃত করেছেন, যিনি জগতের আনন্দ/পিপাসু জীবকে ব্রজের মহাপ্রেমরস অযাচিতভাবে দান করেছেন, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বারংবার প্রণাম করি।

১২। যাঁর দুই নয়নে প্রেম-অশ্রুর প্রবাহ বহিছে, যিনি প্রেমসম্পদ অর্পণ করে কোটি কোটি বৈকুণ্ঠকেও উপহাস করছেন, যিনি ভুবনমোহন অঙ্গকান্তিতে এবং অনির্বচনীয় মাধুর্যে কোটি কোটি অমৃত সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, সেই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী সর্বমনোহর শ্রীগৌরহরিকে বন্দনা করি।

শ্রীনিত্যানন্দ স্তুতি

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স
নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥

সংকর্ষণ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং শেষনাগ যাঁর অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নামক বলরাম আমার আশ্রয় হোন।

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

মায়াতীত, সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্যসমন্বিত চতুর্ব্যূহের মধ্যে যিনি সঙ্কর্ষণ রূপে বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ বলরামের শ্রীচরণকমলে আমি প্রপত্তি করি।

মায়াভর্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

ব্রহ্মাণ্ড সমূহের আশ্রয়স্বরূপ মায়াশক্তির অধীশ্বর, কারণ-সমুদ্রে শায়িত আদিপুরুষ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর একটি অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দরূপী বলরামের শ্রীচরণকমলে আমি প্রপত্তি করি।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্ ।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

যাঁর নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার সূতিকাধাম এবং লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ বলরামকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

যাঁর অংশাতি-অংশের-অংশ হচ্ছেন ক্ষীরসমুদ্রে শায়িত ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা। পৃথিবী ধারণকারী শেষনাগ হচ্ছেন যাঁর কলা বা অংশের অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দরূপী বলরামের শ্রীচরণকমলে আমি প্রপত্তি করি।

শ্রীঅদ্বৈত স্তুতি

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত রয়েছে—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ ॥

মহাবিষ্ণু হচ্ছেন এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মায়ার দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন তাঁরই অবতার।

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদ্ আচার্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তম্ অদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে ॥

যেহেতু তিনি শ্রীহরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব, তাই তাঁর নাম অদ্বৈত এবং ভক্তিশিক্ষক বলে তাঁকে আচার্য বলা হয়, সেই ভক্তাবতার অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শক জাতি, গ্রীক জাতি ও যাবনিক আচার-বিশিষ্ট জাতিগুলি বসতি স্থাপন করেছিল। বিদেশ থেকে আসা এই জাতিগুলির বসতি হওয়ার ফলে নবদ্বীপেও মানুষদের মধ্যে বৈষম্যবিচার প্রবল ছিল। সেজন্য প্রচারক সূত্রে ভগবান গৌরহরি দুই জন ভগবদ্ভজন পরায়ণ মহান ব্যক্তিকে প্রচারকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। একজন হলেন নিত্যানন্দ প্রভু, অন্যজন হলেন ঠাকুর হরিদাস। আর্য-আচার এবং যাবনিক আচার সম্পন্ন জনগণ একে অপরের বাক্যে কর্ণপাত করবে না জেনে, উভয়েরই ভগবদ্ভক্তিতে সমধিক অধিকার আছে, জানাবার জন্য উভয়কেই হরিনাম সংকীর্তনের যোগ্যতা প্রদান করলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বত্রই কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রচারের জন্য আদেশ দিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস ।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা ।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা ।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব ।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥"

'সর্বত্র, প্রতি ঘরে ঘরে'—কোথাও বাকি থাকবে না, কৃষ্ণনাম প্রচার করতে হবে।

'ভিক্ষা'—চৌদ্দ ভুবনের পতি নিত্যানন্দ প্রভু এবং সর্বলোক পিতামহ হরিদাস ঠাকুর যাবেন ভিক্ষা করতে, লোকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে। অহংকারী ধনী লোকেরা ভিক্ষা দিতে অর্থাৎ তাঁদের প্রার্থনা শুনবার পাত্র

নয়, এ সব জেনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদেরকে এক অদ্ভুত লীলারাজ্যে উপনীত হবার জন্য ভিক্ষা করতে নিযুক্ত করলেন।

'বল কৃষ্ণ'—সংসার-বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে, নিজের প্রকৃত স্থিতির দিকে নজর না রেখে এই জগতে অবিরাম অসংখ্য অসার কথা বলে। তাই তাদেরকে দিব্য কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে নির্দেশ দিতে হবে। কৃষ্ণনামই জীবকে প্রপঞ্চ থেকে উদ্ধার করবে।

'ভজ কৃষ্ণ'—কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ লোক এই জগতে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আকৃষ্ট। নিজে ভোক্তা সেজে এই জড় জগৎ ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেটিই তার বদ্ধ থাকার কারণ। তাই কৃষ্ণভজন করবার বিচারবুদ্ধি দিতে হবে।

'কর কৃষ্ণশিক্ষা'—কৃষ্ণই একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু। কৃষ্ণই পূর্ণজ্ঞানময়। কৃষ্ণশিক্ষা প্রভাবে জীবের নিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণভক্তি বিকাশ বিনা সব তথাকথিত শিক্ষাকে অবিদ্যা বলেই নির্ধারিত হয়। তাই কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

'ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা'—কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা—জীবের একমাত্র কৃত্য, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন ছাড়া অন্য প্রকার কোনও ভিক্ষা কারও কাছে প্রার্থনা করবে না।

'দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা'—সারাদিন লোকের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের ভিক্ষা করতে হবে। এটি প্রতিদিনের কাজ। সন্ধ্যা হলেই তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের হিত চেষ্টা করছ, তা জানালে আমি প্রীত হব। এটা আমারই কাজ। তোমরা আমার ডান ও বাম হাত।

'তোমরা করিলে ভিক্ষা যে না বলিব'—তোমরা লোককে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে অনুরোধ করলে যত লোক কৃষ্ণনাম করবে না, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যত্ন নিতে চাইবে না, তাদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হয়ে দাঁড়াবে।

'তবে আমি চক্র হস্তে সবারে কাটিব'—কৃষ্ণবিমুখ লোকদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে এই সংসার চক্রে ঘোরাবো। যদি জীব কৃষ্ণবিমুখ হয়ে ইতর চেষ্টায় দিন যাপন করে, তা হলে পার্থিব স্বভাবের বিধি অনুসারে সে ক্লেশ লাভ করবে।

পতিতপাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

সব রকমের পাপাচারে অভ্যস্ত ছিল জগাই-মাধাই নামে দুই ব্রাহ্মণপুত্র। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন তাঁদের হরিনাম করতে নির্দেশ দিলেন, অমনি তারা নেশামত্ত অবস্থায় নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় মদ্য কলসী ছুঁড়ে মারে। কপালের একস্থানে কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। তাতে নিত্যানন্দ প্রভু কিছুই মনে না করে তাদের হরিনাম করতে নির্দেশ দিলেন। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপস্থিত হয়ে সেই জগাই-মাধাইকে কেটে ফেলবার জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন।

কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু স্মরণ করিয়ে দিলেন, এই অবতারে কোনও অস্ত্রধারণ লীলা নয়, হে মহাপ্রভু, তুমি কৃষ্ণপ্রেম বিলাতে এসেছ ধরাতলে। আবার অস্ত্রকে আহ্বান কেন? তোমার অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কলিযুগের সমস্ত অধঃপতিত মানুষকে উদ্ধার করা। অধিকাংশ মানুষই জগাই-মাধাইয়ের মতো। অধঃপতিত সবাই। আর তুমি মহাবদান্য অবতার। তাদেরকে প্রেম দিয়ে উদ্ধার করো। আগে জগাই-মাধাইয়ের সর্ব অপরাধ ক্ষমা করে তাদের প্রেম দান করো।

মহাপ্রভু বললেন, হে জগাই-মাধাই আমি তোদের ক্ষমা করব, যদি তোদেরকে নিত্যানন্দ প্রভু ক্ষমা করেন। তারা নিত্যানন্দ চরণে পতিত হলে নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইকে তুলে ধরে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন দুটি শর্ত রাখলেন—(১) তোমরা আজ থেকে কোনও পাপকর্ম করবে না। তখন তারা উত্তর দিয়েছিল—না। (২) আজ থেকে তোমরা হরিনাম করবে। তারা উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ। তারপর তারা পরম ভক্তে পরিণত হয়।

শাস্ত্র নির্ধারিত কলিযুগের চারটি পাপের স্তম্ভ হচ্ছে—আমিষ আহার, নেশাভাঙ, জুয়ালটারী ও অবৈধ যৌনতা।

এই পাপগুলি সযত্নে এড়িয়ে থাকতে হবে এবং শ্রদ্ধানিষ্ঠা সহকারে কলিযুগের তারকব্রহ্ম হরিনাম জপ-কীর্তন করতে হবে—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'

পতিতপাবন মহাপ্রভুর শিক্ষা পরম্পরায় আচার্যবৃন্দ বদ্ধজীবকে এইভাবে হরিনাম মহামন্ত্রে ব্রতী করিয়ে উদ্ধার করবার জন্য উন্মুখ।

মহাপ্রভুর কাছে অদ্বৈত আচার্যের প্রার্থনা

শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে মহা আনন্দে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু নৃত্যকীর্তন করতে লাগলেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁর নৃত্য দেখে আনন্দসাগরে বিহ্বল হয়ে ভাসতে লাগলেন। সেই সময় মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে নৃত্য বিরত হতে নির্দেশ দিয়ে নিজ গলার মালা অদ্বৈত প্রভুর কণ্ঠে পরালেন। তারপর, মহাপ্রভু হাসতে হাসতে বললেন, এখন বর চাও। অদ্বৈত আচার্য বললেন, হে মহাপ্রভু, আমি কি আর বর চাইব? তোমার দর্শন পাচ্ছিলাম না। এখন পেয়েছি। তাই আনন্দে নাচছি। এখন কি চাইব তা তো আপনি দিব্য দৃষ্টিতেই জানতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, তোমার আহ্বান জন্যই আমি পৃথিবীতে এসেছি। আমি প্রত্যেকের ঘরে কৃষ্ণ নাম কীর্তন প্রচার করব। যাতে সকল সংসার সেই নামে নৃত্য করে। ব্রহ্মা, শিব, নারদ প্রমুখ যে ভক্তির জন্য তপস্যা করে থাকেন, সেই ভক্তি আমি আপামর জনসাধারণকে প্রদান করে লোকের উপকার করব। এই কথা তোমাকে বললাম।

তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর কাছে একটি বর প্রার্থনা করলেন।

> অদ্বৈত বলয়ে, "যদি ভক্তি বিলাইবা।
> স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥
> বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
> তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে-যে-জন বাধে ॥
> সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
> আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা ॥"

হে মহাপ্রভু, যদি আপনি ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ ভগবৎ সেবা জগতের সবাইকে বিতরণ করবেন, তা হলে যারা এ যাবৎকাল সাধারণের বিচারে ভগবৎ সেবায় 'অযোগ্য' 'অনধিকারী' বলে বিবেচিত; সেই সব লোককে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করুন। যেমন স্ত্রীলোক, শূদ্র, মূর্খ দীনহীন প্রভৃতি। তারাও কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করে নৃত্য করতে থাকুক দিব্য আনন্দে। আর, যে মানুষেরা অহংকারী—বিদ্যার অহংকার, ধনের অহংকার, উচ্চ বংশের অহংকার, তপস্যার অহংকার, প্রভৃতি অহংকারে গর্বিত, সেই সমস্ত মানুষেরা আপনার ভক্তের ও ভক্তির মহিমা বুঝতে না পেরে ঈর্ষাবশত জ্বলে পুড়ে মরুক।

অদ্বৈত আচার্যের এই কথাটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অঙ্গীকার করলেন। (চৈতন্য ভাগবত মধ্য ৬/১৬৭-১৭০)

শ্রীবাস ঠাকুরের ভক্তি নিষ্ঠা

শ্রীবাস ঠাকুরের বিশাল গৃহস্থ পরিবারে কেবল কৃষ্ণনাম করতে থাকলে কি করে পেট চলবে? এরকম প্রশ্ন একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে করলেন। উত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা সর্বান্তর্যামী কৃষ্ণ সবাইকেই খাবার যোগান দেন। তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করলে যদি না খেতে পাওয়া যায় তবে তিনদিন উপবাসী থেকে অবশ্যই গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবো।" শ্রীবাস ঠাকুরের এরকম কথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করলেন, "এরকম কৃষ্ণনিষ্ঠা! তাই আমি কথা দিচ্ছি, 'হে শ্রীবাস ঠাকুর, আমার লক্ষ্মীকেও যদি কখনও অভাবে পড়ে ভিক্ষা করতে যেতে হলেও হতে পারে, কিন্তু তোমার গৃহে কোনদিন অভাব হবে না।"

একদিন শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতে সংকীর্তন কালে অন্তঃপুরে শ্রীবাস ঠাকুরের বড় ছেলে দেহত্যাগ করে। শ্রীবাস পণ্ডিত অন্তঃপুরে গিয়ে পত্নী ও অন্যান্য মহিলাদের বলেন, 'মহাপ্রভুর কীর্তন শুনে দেহত্যাগ মাহাত্ম্যপূর্ণ। তোমরা এখন জোরে কান্না করো না। কেননা আমি চাই মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্তন ভঙ্গ না হোক।' কিন্তু মহাপ্রভু সংকীর্তন বন্ধ করে বললেন, এই ঘরে কোনও অমঙ্গল হয়েছে কি? শ্রীবাস ঠাকুর বললেন, 'হে মহাপ্রভু, যেখানে আপনি স্বয়ং উপস্থিত সেখানে সবই মঙ্গল।' অন্য ভক্তদের কাছে শ্রীবাসপুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শুনে মহাপ্রভু অন্তঃপুরে গিয়ে মৃত শিশুকে তুলে ধরে বললেন, 'তুমি মা-বাবাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ!' মৃত শরীরে আত্মা ফিরে এলো। সে তখন বলল, 'মহাপ্রভু, আপনি সব জানেন। বহু জন্মে বহু মা-বাবা পেয়েছি, বহু দুঃখ পেয়েছি। এই জন্মে পরমভক্ত মা-বাবা পেয়েছি। আর স্বয়ং আপনার নৃত্যকীর্তন দর্শন করে মহানন্দে আপনার ধামেই যাচ্ছি।' এই বলে আত্মাটি চলে গেল। শিশুর কথা শুনে শ্রীবাস ঠাকুরের সারা পরিবার মহাপ্রভুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত শোক ভুলে গেল। মৃত শিশুর সৎকারের পর শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্ররূপে বিরাজ করতে লাগলেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তন কালে নিত্যানন্দ প্রভুর বাহ্য চেতনা প্রায়ই থাকত না। পরনের কাপড় খুলে যেত। মহাপ্রভু স্বয়ং তাকে কাপড় পরিয়ে দিলেও তৎক্ষণাৎ নৃত্য করতে গিয়ে খুলে যেত। সম্পূর্ণ বালকভাবের মতো আচরণ। শ্রীবাস ঠাকুরকে পরীক্ষার্থে মহাপ্রভু বলেন, 'ওই নিত্যানন্দ অবধূত—ওর কোনও জাতকুল ঠিক নেই, ওকে শ্রীবাস পণ্ডিত তার ঘরে রেখে যত অনাসৃষ্টি শুরু করেছে।'

উত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত হাত জোড় করে বলেন, 'ওই ঘর তোমাদের, নিত্যানন্দ ওখানে যা করবে করুক। আমি প্রার্থনা করি, তোমরা দুই ভাই সর্বদা আমার ঘরে থাকো।'

সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে অন্তরে খুবই খুশী হলেন। শ্রীবাস ঠাকুরের নিষ্ঠা যথার্থই রয়েছে।

পঞ্চতত্ত্বের প্রকট-অপ্রকট কথা

৩১০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রিতে পৃথিবীতে কলিযুগ আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে কলিকালের ৪৫৮৬ বর্ষ গত হলে প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমায়াপুরে প্রকট হন। (চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৩/২৯ ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুভাষ্য) সেই দিনটি ছিল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৪০৭ শকাব্দ) ২৩ ফাল্গুন শনিবার পূর্ণিমা তিথি চন্দ্রগ্রহণ সন্ধ্যাকাল। নদীয়ার শ্রীমায়াপুরে শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে তিনি জন্মলীলা প্রকাশ করেন। সেই সময় অসংখ্য লোক গঙ্গাস্নানে এসে হরিধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব দিনটি হল ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারী (১৩৯৫ শকাব্দ) মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি দুপুর বেলা। বীরভূমের একচক্রা গ্রামে পদ্মাবতীদেবী ও হাড়াই ওঝার পুত্ররূপে তিনি জন্মলীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আবির্ভাব দিনটি হল ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দের (১৩৫৫ শকাব্দের) মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি। শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামে নাভাদেবী ও কুবের পণ্ডিতের পুত্ররূপে তিনি জন্মলীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৪৮ বছর বয়সে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে, আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত সেবিত টোটা গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হন। (শ্রীভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ) তার ৮ বছর পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে (১৪৬৩ শকাব্দ) আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে বঙ্কিমরায়ের কাছে অন্তর্ধান লীলা করলেন। (শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত অন্ত্য ১৩ অধ্যায়) গৌরাঙ্গের অপ্রকটের ২৫ বর্ষ পরে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ১২৫ বছর বয়সে ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে, পৌষ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমদনগোপাল মন্দিরে গিয়ে অন্তর্ধান লীলা করলেন। (শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ ২২ অধ্যায়)

বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব। জন্মস্থান চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রাম। মা রত্নাবতী দেবী, বাবা মাধব মিশ্র।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশ। গৌরাঙ্গের চিরসাথী গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর মাত্র ১১ মাস প্রকট ছিলেন। ১৪৫৬ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে নীলাচলে তিনি অপ্রকট হন।

শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ জলধর পণ্ডিতের পাঁচ জন গুণশালী পুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবাস ঠাকুর। তাঁরা শ্রীমায়াপুরে চলে আসেন, শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতেই এক বছর ধরে প্রতি রাত্রে গৌর-নিতাই ভক্তগণ সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁরা কুমারহট্টে চলে আসেন।

চৈত্র কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব এবং আষাঢ় কৃষ্ণা দশমীতে কুমারহট্টে তিনি অন্তর্হিত হন।

কলিযুগের ভাগ্যবন্ত জন নিত্য শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম স্মরণ করেন। তাঁদের স্মরণে ভববন্ধন মোচন হয়। কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। তাঁরা সাধারণের দৃষ্টির অগোচর হলেও ভক্তের কাছে নিত্য বিরাজমান।

তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করেছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

গৌরাঙ্গ-অবতার মহিমা

এই পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হলে জগতের মানুষের চরিত্রে কি পরিবর্তন দেখা গেল, সেই সম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ উল্লেখ করেছেন ঃ—

(১) পাপী মানুষের পাষাণ হৃদয়ও হরেকৃষ্ণ নামের প্রভাবে মাখনের মতো স্নেহে দ্রবীভূত হল।

(২) লোকে যোগ, ধ্যান, তপস্যা, ত্যাগ, নিয়ম, বেদ অধ্যয়ন, সদাচার—এসব কিছুই যারা অনুষ্ঠান করেছিল না, যারা পাপকর্মে নিবৃত্ত হয়েছিল না, সেরকম ব্যক্তিও পরমানন্দে কৃষ্ণপ্রেম লাভের সুযোগ গ্রহণে ব্রতী হল।

(৩) কর্মব্যস্ত কর্মীরা ভগবৎ প্রেম লাভের জন্য স্থির হল। জাগতিক যোগসাধনপর ব্যক্তিরা পারমার্থিক বস্তু লাভের জন্য তৎপর হল। তারা উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্তন করতে লাগল।

(৪) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি বস্তু আবিষ্কার করার পর, যারা জড় বিষয়ে রসমগ্ন ছিল, স্ত্রী-পুত্রাদির কথা নিয়েই দিবস-রজনী মত্ত ছিল তারা সেসব আলোচনা পরিত্যাগ করল। যারা পাণ্ডিত্যজনিত শাস্ত্রতর্ক করছিল, তারা সেসব বাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করল। যারা প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগ অভ্যাস করছিল, তারা সেসব বর্জন করল। যারা তপস্যা করছিল, তারা তপস্যা ত্যাগ করল। যারা মুক্তি কামনা করছিল, যারা ব্রহ্মে বিলীন হতে চেয়েছিল, তারা তাদের সেই মতি পরিত্যাগ করল। তারা সবাই কেবল কৃষ্ণভক্তিরসে মগ্ন হল। বিষয়ীরা, দার্শনিকেরা, যোগীরা, তপস্বীরা, সন্ন্যাসীরা তাদের নিজ নিজ মত-পথ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তিরসে একনিষ্ঠ হয়েছিল।

(৫) যারা নিঃশব্দে হরিনাম স্মরণ করত। তারা উচ্চকণ্ঠে সংকীর্তন সহকারে হরিনাম করতে লাগল। যে গৃহে দিবানিশি সাংসারিক কলহ চলছিল, সেখানে হরিনামের উচ্চরোল চলতে লাগল। যে সব স্থানে,

ঘণ্টাধ্বনি কিংবা কাঁসি ছাড়া কিছুই শব্দ কানে আসত না, সেইসব স্থানে হরিনাম সংকীর্তন শোনা যেতে লাগল।

(৬) লোকেরা পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, দ্বন্দ্ব, হিংসা-প্রতিহিংসা ভুলে গিয়ে একসঙ্গে হরিনাম করতে লাগল এবং প্রীতি সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হল। মনোমালিন্য দুঃখের পরিবর্তে কৃষ্ণসেবাময় আনন্দ পরিলক্ষিত হল।

(৭) অতিদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম যা পৃথিবীতে কখনও কেউ কাউকে অর্পণ করেনি, সেই কৃষ্ণপ্রেম সাধারণের মধ্যে বিতরিত হতে লাগল। লোকে কৃষ্ণকেই জীবনসর্বস্ব জ্ঞান করতে লাগল।

(৮) ভগবৎ সেবায় শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী, জড়মতি, নীচব্যক্তি অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। তারাও ভগবানের প্রেমরসমাধুর্য আস্বাদনে সমর্থ হল।

(৯) বলরাম, মহাদেব, নারদ, কৃষ্ণলীলার সমস্ত গোপ-গোপী এবং বৃষ্ণি বংশ সকলেই গৌরাঙ্গ লীলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

(১০) শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলামাধুর্য তা বিস্তার করবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

(১১) প্রাচীন ধর্ম দর্শন প্রচারকদের বিভিন্ন মত ছিল। যার ফলে কোন্ মত শ্রেয়ঃ, লোকে বুঝে উঠতে পারত না। প্রত্যেকে নিজ নিজ মত শ্রেয়ঃ বলে দাবী করত। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সকলেই অনুভব করলেন যে, বেদের মূল তাৎপর্যই হল কৃষ্ণভক্তি।

(১২) পূর্বে বহু মহান ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লোকে মুক্তির সন্ধান লাভ করেছে। কিন্তু গৌরহরি প্রকটিত হলে লোকে প্রেমানন্দে নিমজ্জিত হয়েছে, এরকমটি গৌরহরি ব্যতীত কারও দ্বারা হয়নি।

(১৩) পরম-আরাধ্য শ্রীশ্রীরাধা-মাধবকে অনেক নির্বোধ লোক কলঙ্কিত বলেও ব্যাখ্যা করত। তারা রাধাতত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও অপরাধ করত। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতে না আবির্ভূত হলে ভগবানের নামমহিমা, প্রেমতত্ত্ব, বৃন্দাবনমাধুরী, রাধাভাব মাহাত্ম্য জগতে কে জানাত?

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের রূপ

পাঁচ জনেরই অঙ্গকান্তি উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বসন সাধারণত পীতবর্ণের, শ্বেত চন্দন ও অগুরু লিপ্ত শরীর, গলায় চাঁপার মালা পরিহিত। নিত্যানন্দ প্রভুর বসন উজ্জ্বল নীলবর্ণের এবং আর তিনজনের বসন কুন্দফুলের মতো শুভ্র।

পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকের মুখ মৃদু হাস্যযুক্ত। কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত। সবার নয়ন আয়ত। পাঁচজনের সংকীর্তন কালে সর্বদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিই অন্য চারজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

শ্রীমায়াপুর ইসকন মন্দিরে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব

চৌদ্দ টন ওজনের অষ্টধাতু সমন্বিত ৭ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ পৃথিবীতে অন্য কোথাও নেই, বলা চলে। অষ্টধাতু হল—সোনা, রূপা, তামা, পেতল, কাঁসা, সীসা, রাং ও লোহা। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলেন। যদিও বা তার বেশ কয়েক বছর আগের থেকেই ছোট ছোট পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ পূজিত হচ্ছেন।

মন্দিরের প্রধান পূজারী শ্রীজননিবাস প্রভু এবং অন্যান্য বহু পুজারী প্রতিদিন বিগ্রহ অর্চন, নতুন নতুন সাজসজ্জা, ভোগরাগ ও আরতি অনুষ্ঠান সম্পাদনে তৎপর।

পরম উদার শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ দুবাহু প্রসারিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর দুই পাশে নিত্যানন্দপ্রভু ও গদাধর পণ্ডিত এবং দুই ধারে অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীবাস ঠাকুর সারা বিশ্বের মানুষকে হরিনাম কীর্তন করে জন্ম সার্থক করতে উদার আহ্বান করছেন।

জগতে আশীর্বাদ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণে উল্লেখ করেছেন—

১। যাঁর গ্রীবা সিংহের মতো, যাঁর হাসি মধু থেকে সুমধুর, যাঁর শ্রীঅঙ্গ অতি দুর্জ্ঞেয় মহাভাবের নিত্যনতুন বিলাসতরঙ্গে অতুল শোভা ধারণ করেছে, সেই শ্রীরাধামাধবের একীভূত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদের রক্ষা করুন।

২। মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর ভাবে ভাবান্বিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মেঘ দেখে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ভেবে আনন্দে বিহ্বলিত হয়ে কখনও মেঘকে দয়িত প্রাণনাথ বলে সম্বোধন করেন, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য পাখা প্রার্থনা করেন, ময়ূর পালক দেখে অধীর হন, গুঞ্জমালা দেখে কম্পিত হন, শ্যামলবর্ণ কোন কিশোর দেখলে চমৎকৃত হন, এভাবে নিজ প্রেমসাগরতরঙ্গে ভাসমান শ্রীগৌরহরি তোমাদের হৃদয়ে উদিত হোন।

৩। শচীগর্ভ সিন্ধুতে এক আশ্চর্য অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে প্রেমরূপ মহা অমৃতময় অপূর্ব জ্যোতি নির্গত হয়ে জগতের ভেতর ও বাইরে আলোকময় করছে। সন্ধ্যার অরুণের মতো বিচিত্র বসনে তাঁর শ্রীঅঙ্গ অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে, তিনি পরম উদার ও করুণার সিন্ধু। সেই শ্রীগৌরচন্দ্র তোমাদের হৃদয়-আকাশে উদিত হোন।

৪। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই লোকমঙ্গল মহামন্ত্র যিনি অবিরত জপ করছেন, প্রেমভাবে যার দুই কম্পমান হস্তে লোকশিক্ষাহেতু কটি ডোরে গ্রন্থি দিয়ে নামসংখ্যা রাখছেন, প্রেমাশ্রুধারায় যাঁর বদনকমল ভেসে যাচ্ছে, যিনি নিজরূপ শ্রীজগন্নাথ দর্শন-ইচ্ছায় যাতায়াত ছলে লোকেদের পাপ হরণ ও আনন্দ বর্ধন করছেন, সেই শ্রীগৌরহরি তোমাদের রক্ষা করুন।

৫। নদীয়াপুরে ভাগ্য-আকাশে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সর্বদা বিরাজ করছেন। তাঁর বিমল কৃপা-কিরণে সমস্ত জগতের অন্তরের জড় কামনাবাসনা অন্ধকার বিদুরিত হচ্ছে। নিজশক্তিতে তিনি প্রেমানন্দরস সাগর বিক্ষুব্ধ করে

জগতকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন। দিনরাত ত্রিতাপদুঃখে অতীব বিকল বিশ্বকে শীতল করছেন। সেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের অঙ্গকিরণছটা সর্বদা তোমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুক।

৬। পরম নিগূঢ় মধুর উজ্জ্বল ব্রজপ্রেমের মধুরিমার কথা কে জানত? শ্রীব্যাসদেব প্রমুখ মুনিগণও তা সুষ্ঠুভাবে জানতে পারেননি। আর অন্যের কথা কি। ভাগবত বক্তা পরমহংস-কুলমুকুটমণি শ্রীশুকদেব তা জেনেও প্রকাশ করতে পারেননি। অন্যের কথা দূরে থাক্ করুণাময় শ্রীগোবিন্দও যা ভক্তজনের হৃদয়ে প্রকাশ করেননি, সেই ব্রজপ্রেমভক্তির মাধুর্যসাগরে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করে থাকেন।

৭। নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন বা যোগমার্গের কথা ততক্ষণই ভালো লাগে যতক্ষণ শ্রীগৌরভক্তের দর্শন হয় না। গৌরভক্তের দর্শন হলে জ্ঞানযোগের আলোচনা তিক্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণ-অনুরাগ মাধুর্যের আস্বাদন জানতে না পারা পর্যন্ত বেদান্তবিদ পণ্ডিতেরা নানা বাদবিতণ্ডায় প্রমত্ত হয়ে থাকে।

৮। গৌরভক্তের যেমন যুক্ত বৈরাগ্য আর কোথায় তা দেখা যাবে? গৌরভক্তের মধ্যে বিষয়ভোগবার্তা নিয়ে নরকের মতো উদ্বেগ নেই। গৌরভক্তদের আনন্দময় ভক্তির অনুষ্ঠান আর কোথায় সম্ভব হয়?

৯। অশ্রুধারাসমাকুল প্রণয়কাতর গৌরহরির মুখপদ্ম দর্শন করলে কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীমতী রাধিকার কথা মনে জাগে। যে ভাগ্যবান একটিবারও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই শ্রীমুখখানি দর্শন করেছে, সে কখনও আর তা ভুলতে পারে না। সর্বদা সে তাঁরই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে।

১০। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনের মহামহিমার কথা শোনা যায়। আরও শোনা যায় তা বেদ ও শ্রুতিগণেরও দুর্লভ। সেই অনির্বচনীয় স্থান লাভের জন্য নিপুণভাবে ধর্মের অনুষ্ঠান, শ্রীভগবানের আরাধনা, সর্বতীর্থ ভ্রমণ কিংবা বেদ অনুশীলন যাই করুন না কেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তের চরণসেবা বিনা তা লাভ হবার নয়।

১১। সমুদ্রমন্থনে অমৃতের উদ্ভব হয়েছিল। তার মধুরতার আস্বাদন লোভে দেবতা ও অসুরেরা প্রমত্ত হয়েছিলেন। সেই এক কলস অমৃত না হয়ে যদি অমৃতের অপার সমুদ্র থাকত এবং তা মন্থন করে যদি কোন অনির্বচনীয় মধুর সারবস্তু লাভ করা যেত, কিন্তু সেই অমৃতসার বস্তুও গৌরচরণের মধুপানে মত্ত ভক্তের কাছে নিতান্ত বিরস হয়ে যেত।

১২। গৌরভক্ত নিজেকে প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু নিরন্তর প্রেমরসে মগ্ন থাকায় তাঁর মনোরম স্নিগ্ধ বহিরাকৃতিই তাদের ধরিয়ে দেয়। অন্তরে গূঢ় প্রেমের অমৃতময় প্রভাব তাদের বাক্যেও প্রকাশ পায়। গৌরসম্পর্কহীন বিষয়ে সে বিরক্ত। সর্বদা সে গৌরপ্রেমে বিহ্বল থাকায় তার বুদ্ধি জড় জগতের অন্য কোনও বিষয় অবলম্বন করতে সমর্থ হয় না।

১৩। যদি শ্রীগৌরাঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তে অনুগ্রহ না পাও, তাহলে কোটি কোটি বছর অন্য গুরুর চরণাশ্রয় করেই সাধন করো কিংবা কোটি কোটি বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করে কণ্ঠস্থ করেই ফেলো, সেই পরমরহস্যবস্তু নিগূঢ় ব্রজপ্রেম কোনও প্রকারেই লাভ করতে পারবে না।

১৪। শ্রীচৈতন্যের চরণনখর থেকে বিকীর্ণ আনন্দজ্যোতির মাধুর্য আস্বাদনে মগ্ন ভক্তগণের যে স্বাভাবিক সদ্‌গুণ সমূহ দেখা যায়,— বৈরাগ্যের চরম সীমা আশ্রয় করতে যদি কেউ সমর্থও হয় তবুও তা গৌরভক্তের গুণলেশের সমতুল্য হয় না। শম দম শান্তি মৈত্রী প্রভৃতির চরম সীমা আশ্রয় করলেও, কিংবা শাস্ত্র-উপদিষ্ট বিষ্ণুভক্তি পূর্ণভাবে যাজন করলেও গৌরভক্তের গুণের কোটি অংশের এক অংশও হবে না।

১৫। ব্রজগোপী বিনা কেউই রাধামাধবের পাদপদ্মের মধুতে মুগ্ধ হয়ে মাধুর্য প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করেনি। বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও তা হবার নয়। যাঁরা গৌরকৃপায় মাৎসর্যশূন্য হয়েছেন একমাত্র তাঁরাই সেই সম্বন্ধ জানতে পারেন।

১৬। আমার মতো দুর্ভাগা মায়াবাদীও নিজেকে মহাপুরুষ বলে মনে করতাম। কিন্তু তেমন কোনও আনন্দ পাইনি। কোনও মহাভাগ্যে

গৌরভক্তের করুণাদৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন পাই। তাতে আমার দুরন্ত অভিমানের অন্ত হল। কিছুটা সাধন করে কিংবা কোন সাধন না করে নিজেকে যদি মহাপুরুষ বলে মনে হয়, তবে একবার মহাপ্রভুকে দর্শন করো, তা হলে সব বৃথা অভিমান যাবে, পরম আনন্দ পাবে।

১৭। কোন সাধন করার শক্তি যার নেই, তার প্রতি এই নিবেদন—একবার পরমাশ্চর্য বৈভবশালী শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ প্রীতিভাবে অর্চন করো। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

১৮। শ্রীহরি অপরাধের বিচার করায় শীঘ্র কাউকে ভজনের প্রেমফল দান করেন না। কিন্তু গৌরহরি মহাবদান্যগুণে উপাসনাকারীকে প্রেম দান করে থাকেন। কলিকালে গৌরাঙ্গকে বাদ দিয়ে হরিনিষ্ঠ হলেও সেই প্রেম সহজে পাওয়া যায় না।

১৯। গৌরচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে নববিধা ভক্তি প্রকাশ করে প্রেমসাগর বিস্তার করেছেন। যে তাতে বঞ্চিত থাকল, সে চিরবঞ্চিত।

২০। যারা জড়সংসারে নিবিড়ভাবে মন দিয়ে অন্ধ হয়েছে, তারা নদীয়ায় রাধাভাবকান্তি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে চিনল না। তারা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হলেও বেদনাময় অচৈতন্য সংসারে বারংবার ভ্রমণ করতে থাকে।

২১। শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে গৌরাঙ্গরূপে নদীয়াধামে আবির্ভূত হয়েছেন উজ্জ্বলপ্রেম মাধুর্য জগতের জীবকে প্রদান করবার জন্য। তাঁর করুণার সঙ্গে যদি পরিচয় না ঘটলো, তবে, উচ্চবংশে জন্ম নিয়েই বা কি লাভ? বহু লোককে মুগ্ধ করার জন্য বক্তৃতা দিয়েই বা কি লাভ হবে? যশ, পাণ্ডিত্য, রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য, দ্বিজত্ব, সন্ন্যাস আশ্রমেই বা কি লাভ হবে? এ সবে শত ধিক্।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহস্র নাম

শ্রীল রূপ গোস্বামী সর্বপাপনাশক, সর্বভয়মোচক, সর্বমঙ্গলদায়ক ভক্তিপ্রদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহস্রনাম উল্লেখ করেছেন—

শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ বিশ্বম্ভরো জগদ্‌গুরুঃ।
জগৎস্বামী জগৎভর্তা জগদ্বন্দুর্জগন্ময়ঃ॥
জগদ্ধাতা বিধাতা চ কারণ করুণাময়ঃ।
কারুণ্যঃ করুণাসিন্ধুর্দীনবন্ধুর্দয়ানিধিঃ॥
নিধির্নিধানো বরদো দাতা নামনিধির্বিভুঃ।
পরায়ণঃ পরানন্দঃ পরমঃ পুরুষঃ প্রভুঃ॥
পরাপ্রেমা পরাভক্তির্ভাবক্রিয়া প্রকাশকঃ।
অবধূতপ্রিয়ঃ শান্তো নিত্যানন্দানুজঃ কবিঃ॥
শচীপুত্রো জগদ্যোনিঃ পরাভক্তিবিদোর্বিদুঃ।
ভাবভক্তিবিনোদী চ প্রেমভক্তিরসার্ণবঃ॥
পূর্ণপ্রেম্নি সদামগ্নঃ কলিক্লেশবিনাশনঃ।
শুদ্ধসত্ত্ববিলাসী চ প্রপন্নদুঃখভঞ্জনঃ॥
অনন্তঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণঃ রৌদ্রো গৌরহরির্প্রভুঃ।
গোবিন্দো গোকুলানন্দো গোপালঃ প্রতিপালকঃ।
অখণ্ডশ্চাক্ষয়পুমান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পরমাত্মা হৃষীকেশঃ দয়ালুর্ভক্তবান্ধবঃ॥
ভক্তপ্রিয়শ্চিদানন্দসন্দোহো ভক্তবৎসলঃ।
ভক্তিরতো ভক্তিগম্যো ভক্তির্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
ভক্তিনন্দী ভক্তিদাতা ভক্তসঙ্গী সদামুদা।
ভক্তিভাবপ্রদাতা চ ভক্তজীবনদুর্লভঃ॥
দুরাধর্ষো দুরন্তো চ দুর্বিকারবিভঞ্জনঃ।
অনাদিরাদি প্রভবঃ পরংজ্যোতিঃ পরাৎপরঃ॥
পরাপরবিনোদী চ মনোবুদ্ধেরগোচরঃ।
নির্মায়ী মায়াধীশশ্চ মায়াপর অধোক্ষজঃ॥
পুংপ্রকৃতির্গুণানন্তো বিশ্বব্যাপী সনাতনঃ।
অখিলাধারমাত্মা চ জ্ঞানজ্ঞেয়ঃ গুণার্ণবঃ॥
অনন্তগুণসম্পন্ন ঈশ্বরঃ কার্যকারণঃ।
করণং কারণ কর্ম কর্তা অব্যক্তঃ মূর্তিবান্॥
অচিন্ত্যশ্চিন্ত্যশ্চিদ্রূপঃ সূক্ষ্মাসূক্ষ্মো মহাবিভুঃ।
মহাপবিত্রশ্চ পুমহান্ মহামূর্তির্মহোত্তমঃ॥
মহাকার্যো মহাকর্তা মহাত্মা চ মহোদধিঃ।
মহাভাবো মহাপ্রেমা মহাকীর্তনলালসঃ॥
মহাপ্রেমী বিরক্তশ্চ মহাবির্ভাব ভাবদঃ।
মহাশুদ্ধো মহাবুদ্ধো মহাসিদ্ধশিরোমণিঃ॥
মহাসত্তশ্চ শান্তশ্চ মহাচিন্ত্যঃ সদাশুচিঃ।
মহানিধির্নিধানশ্চ মহামঙ্গলদায়কঃ॥
মহারসো রসানন্দী রসিকো রস উৎসবঃ।
মহানুগ্রহমনসঃ মহামন্ত্ররতঃ সদা॥
মহামন্ত্রসদাধ্যানং মহামন্ত্র প্রকীর্তিতঃ।
মহামন্ত্রজাপকশ্চ মহামন্ত্র প্রকাশকঃ॥
মহামন্ত্রতত্ত্বযুক্তো মহামন্ত্রধ্বনিঃ সদা।
মহামন্ত্রপ্রদাতা চ জগদুদ্ধারহেতুকঃ॥
প্রভঞ্জনদুঃখং চৈব দমনঃ পাপধ্বংসকঃ।
কলিকালপরং ঘোরং মহাপাপপরায়ণঃ॥
হরিনামকৃতান্ লোকানুদ্ধর্তা শ্রীমহাপ্রভুঃ।
শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীশচীপুত্রঃ চৈতন্যঃ প্রেমসাগরঃ॥
সিংহগ্রীবো মহাভুজঃ নদীয়াদুর্লভোদয়ঃ।
গৌরচন্দ্রঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ নিজনামপ্রকাশকঃ॥
কৃষ্ণঃ কৃপাকরো বিষ্ণুর্বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ।
শ্রীনিধিঃ শ্রীনিকেতশ্চ শ্রীনিবাসঃ সতাংগতিঃ॥
শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ শ্রীসেব্য শ্রীমতাংবরঃ।
শ্রীশঃ শ্রীরাধিকানাথো গোপগোপীমনোহরঃ॥
শ্রীদঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রশ্চ নন্দনন্দন ঈশ্বরঃ।
শ্রীদেবঃ যশোদাপুত্রঃ রাধেশো রাধিকাপ্রিয়ঃ॥
শ্রীরাধাবল্লভঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
শ্রীবল্লভঃ বল্লবীনাং প্রাণবল্লভরচ্যুতঃ॥
শ্রীরাধিকাপ্রিয়ঃ পতিঃ মুরারির্মনোমোহনঃ।
গোবিন্দো গোকুলানন্দঃ শ্রীহরিঃ শ্রীপ্রভুঃ পরঃ॥
শ্রীমোহন বিনোদাত্মা রাধারমণ সুন্দরঃ।
শ্রীমুকুন্দঃ গোপীভর্তা গোপীগোপজনপ্রিয়ঃ॥
শ্রীকান্তঃ লক্ষ্মীকান্তশ্চ রাধাকান্তশ্চ মাধবঃ।
শ্রীনাথো রাধিকানাথো গোপীনাথশ্চ মাপতিঃ॥

বৃন্দাপতির্ব্রজপতিঃ নিজকুঞ্জঃ নিজাশ্রয়ঃ ।
কুঞ্জানন্দঃ ব্রজানন্দঃ বৃন্দানন্দঃ পুরন্দরঃ ॥
কুঞ্জপ্রিয়ঃ কুঞ্জবাসঃ কিশোরী রাধিকাধবঃ ।
রাধামনোহরঃ কৃষ্ণস্ত্রিভঙ্গঃ মুরলীধরঃ ॥
কিশোরীবল্লভঃ কৃষ্ণঃ কিশোরীভাবসংযুতঃ ।
কলৌ গৌরহরিঃ কৃষ্ণঃ রাধানামপ্রকাশকঃ ॥
শিখিপিচ্ছলসচ্চূড়মুকুটৌ মণিমণ্ডিতঃ ।
আজানুবাহুঃ শ্যামাঙ্গঃ কর্ণকুণ্ডলশোভিতঃ ॥
কম্বুগ্রীবঃ পদ্মনেত্রঃ নাসামুক্তামণিপ্রভঃ ।
অধরারুণ বিম্বশ্চ উচ্চহাস্যমনোহরঃ ॥
স্বর্ণকঙ্কণকেয়ূর মণিমুক্তাবিভূষিতঃ ।
শ্রীবৎসবক্ষচিহ্নস্থ বনমালাবিরাজিতঃ ॥
পীতবস্ত্রপরিধানঃ কটিসূত্রৈরলংকৃতঃ ।
শ্রীপাদ অরুণাম্ভোদিঃ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিতঃ ॥
দ্বিভুজঃ মোহনমূর্তির্বেণুবাদনতৎপরঃ ।
কিশোরবয়সঃ কৃষ্ণঃ কিশোরীপ্রাণবল্লভঃ ॥
শ্রীরাধা রাধিকানন্তা কৃষ্ণারাধ্যা চ কৃষ্ণদা ।
কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণরতা কৃষ্ণভাব্যা চ ভাবদা ॥
শ্রীশা শ্রীমাধবী কৃষ্ণকৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণভূষণা ।
শ্রীকৃষ্ণনন্দিনী নন্দা নন্দনন্দনজীবনা ॥
শ্রীমতী কিশোরী ধন্যা কিশোর প্রাণনায়িকা ।
ব্রজেশ্বরী ব্রজানন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥
নিজকুঞ্জ বিলাসী চ নিজকুঞ্জরতিপ্রদা ।
মোহিনী মধুররূপা কোটিচন্দ্রসমপ্রভা ॥
কুন্দেন্দুদন্তরুচিরা নাসাগ্রগজমৌক্তিকা ।
সিন্দুরবিন্দুকা ভালে কোটিসূর্যসমপ্রভা ॥
দিব্যবেশা দিব্যহারা দিব্যভূষণভূষিতা ।
মুখপদ্মং চ মধুরা মন্দহাস্যা সুশোভনা ॥
মৃগাক্ষী শরসংঘাতা ভ্রুকুটীকুটিলাননা ।
স্তনকুম্ভভরাক্রান্তা ক্ষীণকট্যা সুশোভনা ॥
অতীবকোমলপদা চঞ্চলশ্চরণো যুগঃ ।
নীলপট্টপরিধানা কিশোরী কনকপ্রভা ॥
দ্বিভুজা পদ্মহস্তা চ পদ্মিনীলক্ষণান্বিতা ।
কোটিলক্ষ্মীসমকান্তিঃ কোটিলক্ষ্মীসমপ্রভা ॥
শ্রীকৃষ্ণারাধিনী রাধা কৃষ্ণরাধ্যা চ রাধিকা ।
শ্রীকৃষ্ণারাধিতা রাধা রাধাভাবপ্রকাশিতা ॥
কলৌ গৌরাঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণ রাধা চ শ্রীগদাধরঃ ।
কলৌ সংকীর্তনার্থায় অবতারোঽভবদ্ভুবি ॥
উভয়ৌ রাধিকাকৃষ্ণৌ শ্রীচৈতন্যগদাধরৌ ।
গদাধরশ্চ রাধা চ পণ্ডিতঃ শ্রীগদাধরঃ ॥
গদাধরপ্রাণনাথঃ শ্রীচৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ ।
গদাধরসহপ্রীতির্গীতবাদ্যপরায়ণঃ ॥
গদাধরনৃত্যগীতো মহাহ্লাদঃ মহাপ্রভুঃ ।
ভক্তবৃন্দসমাযুক্তো নৃত্যগীত-মহোৎসবঃ ॥
গৌরাঙ্গঃ গোপিকাভর্তা রাধারূপী গদাধরঃ ।
গদাধরপ্রিয়ঃ প্রভুঃ ভক্তভাবশ্চ ভক্তিদঃ ॥
সমস্তভক্তবরদঃ সমস্তভক্তবান্ধবঃ ।
সমস্তভক্তপাবনঃ সমস্তভক্তজীবনঃ ॥
সমস্তভক্তদুর্লভঃ সমস্তভক্তমঙ্গলঃ ।
সমস্তভক্তনায়কঃ সমস্তভক্তসেবিতঃ ॥
সমস্তভক্তকারণঃ সমস্তভক্ততারণঃ ।
সমস্তভক্তভক্তিদঃ সমস্তভক্তমোক্ষদঃ ॥
সমস্তভক্তপ্রেমদঃ সমস্তভক্তভাবদঃ ।
সমস্তভক্তকীর্তিদঃ সমস্তভক্তপুজিতঃ ॥
সমস্তভক্তানন্দঃ সমস্তভক্তসম্পদঃ ।
সমস্তভক্তমোদিতঃ সমস্তভক্তবন্দিতঃ ॥
সমস্তভক্তগম্যতঃ সমস্তভক্তভন্যতঃ ।
সর্বভক্তশিরোমণিঃ পাষণ্ডদণ্ডখণ্ডনঃ ॥
সমস্তদুঃখভঞ্জনং নমামি-পাদপঙ্কজম্ ।
শ্রীমহাপ্রভোঃ ষট্পদী পঠেৎসং পাপনাশিনী ॥
দয়ানিধে শ্রীনিধে করুণানিধে কৃপানিধে ।
নমামি শ্রীমহাপ্রভো দেহি মে ভক্তিদুর্লভাম্ ॥
সমস্তদুঃখভঞ্জনং সমস্তপাপমোচনম্ ।
সমস্তদাসমানসং কৃপাকরং কৃপাময়ম্ ॥
কলৌ কল্মষভঞ্জনং ভবাব্ধিদুঃখমোচনম্ ।
নমামি শ্রীপদাম্বুজং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥
বৈষ্ণবধর্মস্থাপনং বৈষ্ণবধর্মপালনম্ ।
বৈষ্ণবপ্রাণনায়কং বৈষ্ণবজ্ঞানদায়কম্ ॥
বৈষ্ণবসর্ববন্দিতং বৈষ্ণবসর্বসেবিতম্ ।
বৈষ্ণবকামদায়কং বৈষ্ণবভক্তিনায়কম্ ॥

বৈষ্ণবকার্যকারণং সমস্তদুঃখভঞ্জনম্ ।
সমস্তপাপমোচনং নমামি কঞ্জলোচনম্ ॥
বৈষ্ণবপ্রাণজীবনং নমামি ভক্তরূপিনম্ ।
বৈষ্ণবভাবদায়কং নমামি বিশ্বনায়কম্ ॥
বৈষ্ণবজ্ঞানসাগরং গুণাকরং সুখাকরম্ ।
নমামি ভক্তিনাগরং গৌরহরিং কৃপাকরম্ ॥
নমামি পাদপঙ্কজং প্রেমভক্তিশুভাবহম্ ।
প্রেমভক্তিশ্চ দুর্লভো দাতা চ শ্রীমহাপ্রভুঃ ॥
জগন্নাথপ্রিয়সুতো দ্বিজানন্দী দ্বিজোত্তমঃ ।
দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ দ্বিজপ্রিয়ঃ দ্বিজপুজ্যো দ্বিজেশ্বরঃ ॥
জগন্নাথাত্মজঃ শান্তঃ পিতৃভক্তো মহামনাঃ ।
লক্ষ্মীকান্তো রমাকান্তঃ শ্রীকান্তশ্চ শচীসুতঃ ॥
দ্বিভুজশ্চ গদাপাণিশ্চক্রী পদ্মধরো হরিঃ ।
নির্মলো নিরীহো নিত্যং নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥
বিশ্বরূপমরূপঞ্চ বিশ্বকায়ো বিরাটহঃ ।
বিভূতির্বিরদো মায়ামানুষো বিশ্ববিগ্রহঃ ॥
পাঞ্চজন্যধরঃ শার্ঙ্গী বেণুপাণি সুরোত্তমঃ ।
অমানি মানদো মান্যঃ স্বামী পরমধার্মিকঃ ॥
ত্রৈলোক্যনাথনাথশ্চ ত্রৈলোক্যপাবনমহান্ ।
মহাভূতস্বরূপায় বিশ্বগ্রাসায় বিক্রমঃ ॥
কালায় কালরূপায় কালদংষ্ট্রাভিয়াননঃ ।
মহানুগ্রায় কলায় কলিকালমলাপহঃ ॥
উজ্জ্বলবদনাম্ভোজঃ তপ্তকাঞ্চনদেহভৃৎ ।
কমলাক্ষেশ্বরঃ প্রীতো গোপলীলাধরো যুবা ॥
স্বনামগুণভাবশ্চ নামোপদেশকারক ।
নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যো রসবিগ্রহঃ ॥
পূর্ণঃ শুদ্ধঃ নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনঃ ।
নামসঙ্কীর্তনহেতু নিজনামোপদেশকঃ ॥
আচণ্ডালপ্রিয়ঃ শুদ্ধঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতঃ ।
সর্বনামপ্রদাতা চ জগদুদ্ধাররূপধৃক্ ॥
জড়চৈতন্যরূপশ্চ জড়চৈতন্যমোক্ষদঃ ।
কৃমিকীটপতঙ্গেঽপি আত্মভক্তি প্রকাশিতঃ ॥
আত্মপ্রিয়ঃ শুচিঃ শুদ্ধঃ ভাবদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
মহানন্দী মহামূর্তি নারায়ণঃ নরোত্তমঃ ॥
অদ্বৈতো দ্বৈতরহিতঃ শ্রীঅদ্বৈতস্তুতোঽপি চ ।
সীতাদ্বৈতপ্রিয় প্রভুরদ্বৈতবচনে রতঃ ॥
অবনিমানিনাদ্বৈতঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ ।
আচার্য শ্রীমহাদ্বৈতঃ শান্তিপুরশিরোমনিঃ ॥
নাম্না শ্রীঅচ্যুতানন্দঃ শ্রীঅদ্বৈতসুতপ্রভুঃ ।
ভিন্নাত্মা ভিন্নরূপশ্চ এক এব দ্বিরূপকঃ ॥
সীতায়া জায়াতে পুত্রঃ জগদাত্মা জগন্ময়ঃ ।
চৈতন্য সোঽচ্যুতানন্দ এক এব ন সংশয়ঃ ॥
অদ্বৈতপ্রাণনাথশ্চ অদ্বৈতপ্রাণদায়কঃ ।
অদ্বৈতবাক্যমানী চ অদ্বৈতপুজিতোঽপি চ ॥
অদ্বৈতসঙ্গনিরতো রাধাভাবেন মোহিতঃ ।
রাধিকারাধিতো নিত্যো নিত্যানন্দনিমগ্নকঃ ॥
নিত্যানন্দপ্রাণবন্ধুঃ নিত্যানন্দপ্রিয়েশ্বরঃ ।
নিত্যানন্দানুজো গৌরঃ ষড়্ভুজদর্শনঃ প্রিয়ঃ ॥
ধন্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাগ্রজস্বরূপকঃ ।
নিত্যানন্দস্বরূপশ্চ পিতরাবতুলাশ্রয়ঃ ॥
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রশ্চ বসুধাজাহ্নবাপতিঃ ।
শ্রীবীরভদ্রজনকো সর্বপাষণ্ডদণ্ডনঃ ॥
নিত্যানন্দানুজঃ কৃষ্ণঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ ।
গদাধরপ্রাণনাথঃ লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াপতিঃ ॥
মুকুন্দসিদ্ধিদো দীনো বাসুদেবামৃতপ্রদঃ ।
গুরুভক্তো ব্রহ্মচারী নিগমাগমতৎপরঃ ॥
বিদ্যানিধিস্ত্রিলোকেশো আর্তিহা শরণপ্রিয়ঃ ।
বৈকুণ্ঠনাথো লোকেশো ভক্তাভিমতরূপধৃক্ ॥
মহাযোগেশ্বরঃ সিদ্ধো মহাযোগীবরপ্রদঃ ।
জ্ঞানভক্তিবিদো বিদ্বান্ সর্ববিদ্যাবিদো বিভুঃ ॥
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং দায়কঃ সর্বনায়কঃ ।
জ্ঞানভক্তিবরপ্রদঃ পীযুষবচনে রতঃ ॥
পীযুষবচনঃ পৃথ্বীপাবনঃ সত্যবাক্যদঃ ।
গৌড়দেশজনানন্দঃ সন্দোহামৃতরূপধৃক্ ॥
গৌড়ানন্দো জনানন্দঃ জ্ঞানানন্দো মনোহরঃ ।
বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপতির্গৌরচন্দ্রঃ সুধাকরঃ ॥
কলাষোড়শসম্পূর্ণঃ পূর্ণব্রহ্মঃ সনাতনঃ ।
চৈতন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ দণ্ডধৃক্ ন্যস্তদণ্ডকঃ ॥
অজো জন্মোরহিতশ্চ বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সৎকীর্তিঃ সংশয়চ্ছিন্নঃ জ্যোতিরূপশ্চারূপকঃ ॥

স্বভাবনিত্যমানন্দঃ অশোকঃ শোকবর্জিতঃ ।
অতুলভাবমনসঃ আত্মভক্তিপ্রবর্তকঃ ॥
অচিন্ত্যো লোকবন্ধুশ্চ লোকানন্দঃ নিধিপ্রদঃ ।
ইন্দ্রাদিসর্বদেবেষু বন্দিত শ্রীপদাম্বুজঃ ॥
ভগবান্ ভক্তশ্রেষ্ঠশ্চ ভগদ্ধর্মবর্চসঃ ।
মহানুদারহৃদয়ঃ উদাসীনঃ জনপ্রিয়ঃ ॥
গৌরাঙ্গোবল্লবীকান্তঃ শ্রীকৃষ্ণো ব্রজমোহনঃ ।
অকিঞ্চনপ্রিয়ো বন্ধুর্গুণগ্রাহী গুণার্ণবঃ ॥
ন্যাসীচূড়ামণিঃ কৃষ্ণঃ সন্ন্যাসাশ্রমপাবনঃ ।
দণ্ডধৃক্ ন্যস্তদণ্ডশ্চ কমণ্ডলুধরঃ প্রভুঃ ॥
মুণ্ডিতো মুণ্ডঃ কঞ্জাক্ষঃ প্রসন্নবদনোজ্জ্বলঃ ।
উজ্জ্বলো ভাবাভাবশ্চ কৌপীনকটিশোভিতঃ ॥
রক্তাম্বরপরিধানো দ্বিভূজশ্চ চতুর্ভূজঃ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারকঃ বনমালিকঃ ॥
ষড়ভূজশ্চ ধনুর্বাণঃ মুরলীদণ্ডশোভিতঃ ।
পাষণ্ডমনোদণ্ডঃ দুর্বিকারবিভঞ্জনঃ ॥
ধুলীধূসর গৌরাঙ্গো রাধাভাবেন গদ্‌গদঃ ।
অনন্তগুণসম্পন্নঃ সর্বতীর্থৈকপাবনঃ ॥
সাক্ষাৎপ্রেমকৃপামূর্তিঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ ।
ভক্তশ্চ প্রেমপুলকো মধুরশ্চামৃতপ্রদঃ ॥
জগন্নাথশ্চ নাথশ্চ জগদুদ্ধারহেতুকঃ ।
জগন্মাতা পিতা বন্ধু দাতা গোপ্তা জগৎপ্রিয়ঃ ॥
অপ্রমেয়ঃ পদ্মনাভঃ পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ ।
বিশিষ্টঃ সৃষ্টিকর্তা চ সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥
সর্বদর্শী বিমুক্তশ্চ সর্বজ্ঞসর্বদায়কঃ ।
সর্বাত্মা চিৎসুখশ্চৈব চিৎস্বরূপী জনার্দনঃ ॥

চিদাভাসী চিদানন্দী চৈতন্যশ্চিৎপ্রকাশকঃ ।
দয়ামন্তা কৃপাভানুঃ কৃপাসিন্ধুঃ কৃপাময়ঃ ॥
কৃপামূর্তিঃ কৃপানাথঃ নিজনামপ্রবর্তকঃ ।
প্রবর্তমপ্রবর্তং চ সর্বজ্ঞঃ সর্বতোমুখঃ ॥
সুলভঃ সুন্দরঃ শুভ্রঃ সুব্রতঃ শুভদায়কঃ ।
শুভমূর্তিঃ শুভাত্মা চ শুভমোক্ষপ্রদায়কঃ ॥
শুভরূপঃ শুভানন্দঃ শুভনাথপ্রবর্তকঃ ।
প্রবর্তকো নিবৃত্তাত্মা তত্ত্ববেত্তা উদারধীঃ ॥
তত্ত্বভাবো নয়ানন্দী তৎপরস্তত্ত্বদর্শনঃ ।
তৎকথাতদ্‌গুণানন্দস্তত্ত্বাবস্তত্ত্বমানসঃ ॥
তন্মূর্তিস্তদ্‌গুণেমগ্নস্তত্ত্বধ্যানং চ তন্ময়ঃ ।
তত্তমাম সদামগ্নঃ তত্তমামপ্রসাদকঃ ॥
চতুর্মূর্তির্বপুর্ভূত্বা চতুর্ব্যূহশ্চতুর্ভূজঃ ।
চতুর্বেদশ্চতুর্ভাবচতুর্মোক্ষপ্রদায়কঃ ॥
অমূর্তির্বিভবঃ ব্যাপী মতিদঃ সর্বদৃগ্ দৃশঃ ।
স এব সংগ্রহসর্বঃ সর্বহৃৎ সর্বভাবনঃ ॥
সহস্রমূর্তিঃ প্রভবঃ সহস্রাক্ষঃ শিরোমুখঃ ।
সহস্রবর্ণো বিশ্বাত্মা সহস্রভুজপাদকঃ ॥
অকারশ্চ উকারশ্চ মকার উর্ধ্বমাত্রকঃ ।
পরমানন্দরূপশ্চ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ ॥
চৈতন্যচন্দ্র উদিতঃ নিশারূপ কলৌ যুগে ।
নমস্তে শ্রীশচীপুত্র। কলৌ জীবহিতপ্রদঃ ॥
দশাবতারা অস্যৈব চৈতন্যো ভগবান্ স্বয়ম্ ।
রাধাভাবপ্রকাশার্থম্ অবতারো মনোহরঃ ॥
ইতীদং কীর্ত্তয়োক্তঞ্চা চৈতন্যনামদুর্লভম্ ।
সহস্রনামদিব্যঞ্চ অশেষেণ প্রকাশিতম্ ॥